টারজান সিরিজ—২

টারজান এণ্ড হিজ মেট



নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট, লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জানুয়ারী
১৯৬১

ছেপেছেন—
কুমারেশ ভট্টাচার্য্য
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, বিধান সরণী,
কলিকাতা—৬


উপহার

আমাদের কথা

টারজানের অ্যাডভেঞ্চারের গল্পগুলি 'শুকতারা'য় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুলি পড়ে পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে এগুলি পুস্তকাকারে পাবার জন্য আমাদের বহু অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁদের তাগিদে টারজানের সেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রকাশক

টারজান এণ্ড হিজ মেট্

প্রথম পর্ব

সমস্যা ও সাথীর সহায়তা

পার্বত্য নদী—এঁকে-বেঁকে চলেছে। টারজান নোরাকে পিঠে নিয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা কি ঘট্ছে না ঘট্ছে, আকস্মিকতার প্রথম ধাক্কায় নোরা তা' বুঝেই উঠ্তে পারেনি। পরে যখন তার সম্বিৎ ফিরে এলো, তখন আর উপায় ছিল না। টারজানকে ফেরানোও সম্ভব নয়, আর টারজানের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের ফিরে যাওয়া আরও অসম্ভব। তবু নোরা চেষ্টা করেছিল, যদি টারজানকে ফেরাতে পারে। কিন্তু বন্দী পাখী মুক্তি পেয়েছে, স্বেচ্ছায় যে সে আর খাঁচায় ঢুকবে, তেমন সম্ভাবনা কোথায়? টারজানের বন্যপ্রকৃতি আবার উদ্দাম হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিছুটা এগুতেই একটা বাঁক—বাঁক পেরিয়েই টারজান নদীর উপর নুয়ে-পড়া একটা গাছের ডাল ধরে থামলো। তারপর পেছনপানে তাকালো। না, কাউকে দেখা যায় না। কালো মানুষটাও আড়ালে পড়ে গেছে। ডাল ধরে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে সে ডাঙ্গার দিকে এগুতে লাগলো—নিবিড় বন, অভ্যন্তরে নিকষকালো অন্ধকার।

ভয়ে নোরার বুক কেঁপে উঠ্লো, তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে

দু'হাতে টারজানের গলা জড়িয়ে ধরলো। টারজান ডাঙ্গায় উঠে নোরাকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে তুলে নিলো। তারপর তাকে নিয়ে দ্রুতপদে নিবিড় বনে প্রবেশ করলো। যেতে যেতে একটা পাহাড়ের সিঁড়িতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে নোরাকে সেখানে শুইয়ে দিল। নিজেও অনেকক্ষণ পরিশ্রম করেছে, তাই সে-ও বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়লো। আনন্দে তার মন পরিপূর্ণ, অল্পেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু নোরার চোখে ঘুম নেই—একে তো ভয়ে সে আধমরা, তার উপর আবার দুশ্চিন্তার বোঝা তার কাঁধে, এ কোন্ পথে এসে পড়লো সে? কী হবে তার ভবিষ্যৎ? সে কি আর কখনও তার বাবার নিকট ফিরে যেতে পারবে? অথবা ফিরে যাবেই বা কেন? সে তো প্রথম দর্শনেই মনেপ্রাণে টারজানকে কামনা করেছিল—টারজানকে তো একান্তভাবে আপনার করেই সে পেয়েছে। তবে আর সে যেতেই বা চাইছে কেন? কিন্তু এই ভাবনায়ও তার মন বাগ মানে না। সুসভ্য ইংরেজ-দুহিতা—নিবিড় অরণ্যে এক পশু-মানবের সঙ্গে সে জীবন যাপন করবে, এই ধারণাও তার আজন্ম-পোষিত শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিকূল। এমনি ধরনের অগুছালো ভাবনা তার মনকে ভরে রেখেছিল।

অকস্মাৎ নোরার চীৎকারে টারজান জেগে উঠলো···তাকিয়ে দেখ্‌লো, গুটি গুটি এগিয়ে আসছে এক নেকড়ে। চোখে তার লোলুপ দৃষ্টি। ক্ষুধার্ত নেকড়ে মানুষের গন্ধ পেয়েছে, এগিয়ে আসছে সে। টারজান বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় পেলো না—হাতের কাছে প্রকাণ্ড এক পাথরের টুকরো পেয়ে দু'হাতে তুলে

ধরলো মাথার উপর। ব্যাঘ্র-পুঙ্গব তার আহার্যের দিকেই নজর রেখেছিল। এই নিবিড় বনে কোন বিপদের আশঙ্কাই তার মনে



গুটি গুটি এগিয়ে আসছে এক নেকড়ে—৬ পৃষ্ঠা

জাগেনি—তাই সে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে। আর এক ধাপ উপরে উঠলেই শিকার যখন তার নাগালের মধ্যে এসে পড়বে, সেই

মুহূর্তে পাথরের চাঁই এসে পড়লো নেকড়ের মাথায়—কোন কিছু ভাববার আগেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হলো। বিপন্মুক্ত নোরা আনন্দের আবেগে জড়িয়ে ধরে টারজানকে।

কিন্তু বিপদ একা আসে না, নেকড়েও দলভ্রষ্ট হয়ে আসেনি। পেছনেই ছিল তার সাঙ্গোপাঙ্গ। এতক্ষণে তারাও দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু এবার আর দৈহিক বলে রক্ষা পাবে না। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই টারজান এই সহজ সত্যটা বুঝে মুহূর্তে উপায় স্থির করে নিল। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সে নোরাকে পিঠে নিয়ে পেছনে হঠতে লাগলো। কিন্তু নেকড়ের দল আর কয়েক ধাপ এগিয়ে এলেই তাদের ধরে ফেলতে পারবে। টারজান এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো বিরাট এক বনস্পতি। সে অকূলে কূল পেলো। ঝুরি বেয়ে খানিকটা উঠেই এক ঝুঁকি দিয়ে এগিয়ে গেল কিছুদূর। সেখান থেকে আবার এক গাছের ঝুরি বেয়ে আরও খানিকটা সরে গেল। এমনিভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা নেকড়ের দল থেকে অনেকটা দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু এইভাবে তো চলবে না। টারজান না হয় পাহাড়ে-বনে আর গাছে-গাছে ঘুরেই সময় কাটিয়ে দিতে পারে—ইচ্ছে হলে যেখানে খুশী বসেই দু'দণ্ড ঘুমিয়ে নিতে পারে। কিন্তু নোরা—তার তো এভাবে চলবে না। দু'মাস সভ্য-জগতের সংস্পর্শে এসে টারজান এটুকু বেশ বুঝেছিল। তার এই দু'মাসে পরিবর্তনও বেশ হয়েছিল—কিছুটা মানুষের বুদ্ধি তার মধ্যে ফিরে আসায়, সে তো অরণ্যরাজ্যে এখন দুর্ধর্ষ এবং অজেয় হবার দাবী রাখে। বন্য শক্তির সঙ্গে মানবীয় বুদ্ধির সংমিশ্রণ—এ যে সোনায় সোহাগা।



মুহূর্তে সচেতন হয়ে গেঁজ থেকে ছুরিটা বার করে..

তার উপর এখন নোরা আছে সহায়—কাজেই তার আর ভাবনাচিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু নোরা—নোরার তো আগে একটা আস্তানা করা দরকার।

টারজান সত্যি চিন্তিত হয়ে পড়লো। হঠাৎ তার সাথী হাতীবন্ধুর কথা মনে পড়লো। বনরাজ টারজানের সাথী ও বন্ধুর অভাব নাই, কিন্তু হাতীবন্ধুর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। কতবার কত বিপদেই না সে তার সহায়তা পেয়েছে! নতুন সমস্যায় প্রথমেই মনে পড়লো হাতীবন্ধুর কথা।

অমনি হাত দুটো শাঁখের মতো করে মুখ তুলে বিকট এক আওয়াজ করলে টারজান। দূরে দুপ্‌ দাপ্‌ শব্দ শোনা যেতে লাগলো, পাগলের মতো ছুটে আসছে তার হাতীবন্ধু। কতদিন পর উভয় বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটলো—দীর্ঘ দু'মাস! মাঝখানে বন্দী-শিবিরে যে সময়টা টারজান কাটিয়ে এসেছে, হাতীবন্ধু রোজই দূর থেকে তাকে আহ্বান জানাতো। প্রথম প্রথম সাড়াও মিলতো—কিন্তু ক্রমশঃ কী করে যেন টারজানের মন ঘরে বাঁধা পড়ে গেল। হাতীবন্ধুর ডাকে সাড়া দেবার উৎসাহ আর তার ছিল না। হাতীবন্ধু ভেবেছিল, টারজানকে বুঝি আর সে ফিরে পাবে না। এহেন টারজান যখন আবার ডাক দিয়েছে, হাতীবন্ধু কি আর চুপ করে থাকতে পারে? পাগলের মতো তাই সে ছুটে এসেছে। হাতীবন্ধুর শুঁড় জড়িয়ে ধরে টারজানের সে কি আকুলি-বিকুলি।

হাতীর অকস্মাৎ নজর পড়লো সেই সাদা মেয়েটার উপর—একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো সে। তাকালো টারজানের দিকে—বুঝতে পারলো টারজান। কী যেন সে বুঝালো তার বন্ধুকে। খুশী হয়ে হাতীবন্ধু



হাত দুটো শাঁখের মতো করে বিকট আওয়াজ করলে—৯ পৃষ্ঠা

শুঁড় দিয়ে তুলে নিল নোরাকে। নোরা তো ভয়েই অস্থির। কিন্তু না, ভয়ের কিছু নেই—হাতী তাকে অতি সন্তর্পণে পিঠের উপর বসিয়ে দিল। টারজানও চড়ে বসলো তার পিঠে। হাতী চলছে আপন

টা[illegible] সানির বকবকানিতে, আর স্ব-স্ব মনে—আর তারা দু'জনে বসে কখন গল্প [illegible] মুখে দিচ্ছে, কখন দুটো ফুল তুলে নিচ্ছে। [illegible] ভাবে কত

হাতী গিয়ে দাঁড়ালো এক পাহাড়ের গুহামুখে। তারা [illegible] নেমে এলো। টারজান আগে অতি সন্তর্পণে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখে শুনে ফিরে এসে আবার নোরাকে নিয়ে গেল। নোরা বুঝতে পারলো—এই তার আশ্রয়স্থল। অতঃপর অনির্দিষ্টকালের জন্যে এখানেই তাকে থাকতে হবে। সে ভাবলো—এই কি আমার মৃত্যু, না নূতন জীবন?

আবার তোড়জোড়

নাইরোবি থেকে রুয়েঞ্জারী পর্বতমূলে মিঃ রিচার্ডের শিবির প্রায় এক মাসের পথ। টারজানকে শিবিরে বন্দী রেখে সানি সোজা নাইরোবির দিকে রওনা হয়েছিল—পথে সে ইচ্ছা করে কোথাও দেরী করেনি। কিন্তু তবু মন চাইলেই, পথ তো আর ছোট হয় না। তাই দীর্ঘ পার্বত্য পথ অতিক্রম করে কিসুমু বন্দরে এসে পৌঁছুতেই তার যথেষ্ট সময় চলে গেল।

পথে পথে যেখানে বান্টুদের গ্রাম পেয়েছে, সেখানেই রাত্রির আতিথ্য গ্রহণ করেছে। আর পরদিন দু'একজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে এগিয়ে গেছে আর একদিনের রাস্তা। এইভাবে কিসুমু পৌঁছনোর পর তাকে ধরতে হলো জলপথ। জলপথে এই সুবিধে পাওয়া যাবে না। তাকে দু'একদিন বন্দরে অপেক্ষা করতে হলো সঙ্গী-সাথী আর নৌকোর জন্যে। তারপর সেখান থেকে রওনা হলো নাইরোবির পথে।

এখন তার প্রভু-দম্পতি সকাশে উপনীত
যাঁদের অভাবে একেবারে ধৈর্যহারা হয়ে রুয়েঙ্গারী
জন্যে তৈরী হচ্ছেন। সানি সুসংবাদ নিয়ে গিয়েছিল,
তাই তাঁরা আনন্দের সঙ্গেই তাকে গ্রহণ করলেন।

সানি পৌছনোর পর দু'একদিনের মধ্যেই তাঁরা রওনা হলেন। পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন, নৌকোর বন্দোবস্ত করাই ছিল, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কেবল রওনা হবার অপেক্ষা। সানি আসায় সুবিধেই হয়েছিল—তার পক্ষে স্বজাতীয় সঙ্গী যোগাড় করা সহজতর হলো। যথাদিনে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের যাত্রা শুরু হলো।

দীর্ঘদিনের পথ, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁদের নিকট একঘেয়ে ঠেকেনি। যদিও এ অঞ্চল তাঁদের পূর্ব-পরিচিত,—এখানেই তাঁরা তাঁদের একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে গিয়েছিলেন, তবু প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধানে সেই স্মৃতি লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। বিশেষতঃ—সুদীর্ঘকাল সুসভ্য জগতে বাস করবার ফলে অরণ্য-সৌন্দর্যের প্রতি তাঁরা সহজেই আকৃষ্ট হলেন। তাই পথের সৌন্দর্যই তাঁদের সর্বপ্রকার ক্লান্তি হরণ করে নিচ্ছিল।

নদীর দু'পাশে কোথাও বান্টুদের গ্রাম, কোথাও এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়, কোথাও বা মাইলের পর মাইল নিবিড় অরণ্য। সে দৃশ্য ভয়ংকর, কিন্তু সুন্দর। হিংস্র শ্বাপদের ভয়াবহ গর্জন যখন প্রাণে ত্রাসের সৃষ্টি করে, তখনই হয়তো কত কি নাম-না-জানা বন্য ফুলের সৌরভ প্রাণকে মাতিয়ে তোলে। বান্টুদের কোন গ্রামে এলেই সানি দেশীয় ভাষায় ডেকে ডেকে তাদের সঙ্গে কথা বলে, কুশল-সংবাদ বিনিময় হয়, পথের কথা জিজ্ঞেস করে। দিনের বেলাটা এই ভাবেই

কেটে যায়। আর রাত কাটে সানির বকবকানিতে, আর স্ব-স্ব কল্পনাবৈচিত্র্যে।

সানি অনবরত বলে যায়, টারজানের কথা। কী ভাবে কত কৌশলে তাকে কাবু করা হলো—সানিকে দেখলে সে কি রকম চটে যায় ইত্যাদি। আর বলে টারজানের দেহসৌন্দর্য ও তার বলশালিতার কথা। টারজানের সম্বন্ধে যতটুকু জানে, তার সবটুকুই কতবার, কতভাবে সানি বর্ণনা করেছে, তার হিসেব নেই। এমন কি, টারজানের পিঠে যে জড়ুল চিহ্নের কথা শ্রীমতী উইলসন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার হুবহু বর্ণনা পর্যন্ত সানি দিতে পারে।

শ্রীমতী উইলসন ভাবেন—এতদিন পর হারানো ছেলেকে পেয়ে তিনি কী ভাবে গ্রহণ করবেন! তাকে আবার মানুষ করে সভ্যসমাজে বার করা যাবে কিনা কে জানে? মনে মনে অবশ্যি তাঁর একটা আশা আছে—মিঃ রিচার্ডের সহৃদয় কন্যা 'নোরা' হয়তো বা তাঁর গৃহলক্ষ্মী হয়ে আসতে রাজী হতেও পারে। তবে আর তাঁর কোন ভাবনাই নেই। এমনি ধরনের সাত-পাঁচ কথা ভেবেই তাঁর সময় কাটে।

সময় কেটেই যায়—যত শীঘ্র অবশ্যি তাঁরা কাটাতে চান, তত শীঘ্র কাটে না, তবু কেটেই চলে। অবশেষে পথ তাঁদের শেষ হয়ে এলো। মাঝখানে কিস্মুতে তাঁদের দু'দিন দেরী হলো—টারজানের ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্যে। এই সময় তিনি দু'জন সঙ্গীকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মিঃ রিচার্ডের নিকট।

পথ তাঁদের শেষ হলো। সানি অধীর আগ্রহে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—ঐ যে সামনেই রিচার্ডের তাঁবু দেখা যায়। ডাক্তার

উইলসন আশা করেছিলেন, মিঃ রিচার্ড এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করবেন। কিন্তু পথে তাঁদের দেখা না পেয়ে ভাবলেন—হয়তো বা তিনি চিঠিই পাননি। সানি তাঁবুকে প্রবেশ করেই সোৎসাহে চীৎকার করে নিজেদের আগমন-সংবাদ ঘোষণা করলো। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তাঁবুর মধ্যে তো আনন্দোল্লাসের কোন চিহ্ন ফুটে উঠ্‌লো না। তাঁবু থেকে অবশ্যি মিঃ রিচার্ড, মিঃ আয়রনসাইড এবং অন্যান্য অধিবাসীরা বেরিয়ে এসে ডাক্তার-দম্পতিকে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু তাঁদের চোখে জল কেন?

ধীরে-সুস্থে সব-কিছু শুনলেন ডাক্তার-দম্পতি। কপাল দেখিয়ে ডাক্তার উইলসন বল্লেন—কপালই সব। নইলে দু'মাস বন্দী থেকে ঠিক তাঁদের আসবার দিনটিতেই টারজান পালাবে কেন? কিন্তু এবারকার ক্ষতি তো শুধু তাঁর একার নয়—মিঃ রিচার্ড যে তাঁর চেয়েও অনেক বেশি হারালেন। মাতৃহারা কন্যা—মিঃ রিচার্ডই তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। নোরার অন্তর্ধানে মিঃ রিচার্ডের নিকট জগৎ-সংসার শূন্য হয়ে গেল। তিনি একেবারে গা ছেড়ে দিয়েছেন। কে জানে তাঁর প্রিয়তমা কন্যা নোরা বেঁচে আছে কিনা!

প্রহরী খবর দিয়েছিল যে খরস্রোতা পার্বত্য নদীর টানে তারা ভেসে যাচ্ছে। এ চোট তারা সামলাতে পারবে কিনা কে জানে? আর পারলেও কুমীরের হাত থেকে নিস্তার পাবে কি? তাও যদি বা দৈবক্রমে বেঁচে যায়, তবে হিংস্র-শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই তার নেই। এই সমস্ত ভেবে মিঃ রিচার্ড ধরেই নিয়েছেন

যে নোরাকে আর ফিরে পাবার কোন ভরসাই নেই। মিঃ আয়রন-সাইড তাঁকে আশ্বাস দিলেন—টারজান কাছে থাকতে নোরার কোন ভয়ই নেই। কাজেই অবিলম্বে তাদের উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা করাই সংগত।

ডাক্তার উইলসন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বোধ করছিলেন। তাঁর ছেলের জন্যেই মিঃ রিচার্ড তাঁর কন্যাকে হারালেন। কাজেই নিজের পুত্রশোকের কথা ভুলে তিনি মিঃ রিচার্ডকে সান্ত্বনা দান করতে লাগলেন।

পরামর্শ-সভা বসলো। কী উপায়ে নোরা আর টারজানকে আবার ফিরে পাওয়া যায়—তারই পরামর্শ। সভা বসলো—একদিন, দু'দিন নয়, উপর্যুপরি কয়েকদিন। কিন্তু কোন কার্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হলো না। আর মিঃ রিচার্ড এতে বিশেষ গা দিচ্ছেন না। কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নোরা আর বেঁচে নেই। কিন্তু মিঃ আয়রনসাইড এবং ডাক্তার ও শ্রীমতী উইলসনের তাগিদে তিনিও আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারলেন না। অগত্যা কিছুটা খোঁজাখুঁজি চল্লো।

এর মধ্যে একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে সানি এসে সংবাদ দিল যে অরণ্যে সে টারজানের চীৎকার শুনতে পেয়েছে। মিঃ রিচার্ড সন্দেহ প্রকাশ করলেন,—কিন্তু সানি জোর দিয়েই বল্লো—এ আওয়াজ ভুলবার নয়। টারজান যে বেঁচে আছে, এ সম্বন্ধে তার বিশ্বাস একান্ত দৃঢ়। আর টারজান বেঁচে থাকলে নোরারও যে কোনও অনিষ্ট হতে পারে না—এই সহজ সত্যটা তাঁরা কেউই অস্বীকার করতে পারলেন না। অগত্যা সবাই আবার কোমর বেঁধে লাগলেন নোরা আর টারজানের উদ্ধার সাধনে।

দ্বিতীয় পর্ব

নতুন অভিযাত্রী-বাহিনী

ডাক্তার মরিসন ইংলণ্ডের একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে তাঁর দান—বিশ্বের শিক্ষিত সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। অধীর আগ্রহে তিনি অপেক্ষা করছেন লণ্ডনের একটি প্রভাতী পত্রিকায় কবে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ ছেপে বেরুবে, তার জন্য।

পাঠকের মনে থাকতে পারে—যে সংবাদ পেয়ে অধীর আগ্রহে ছুটে এসেছিলেন ডাক্তার উইলসন-দম্পতি আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যে হারানো সন্তানের সন্ধানে, সে সংবাদটি ডাক্তার মরিসনেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনিও ভাবছিলেন গরিলা-পালিত এই মানব-সন্তানটিকে পর্যবেক্ষণ করে মনস্তত্ত্বের এক রহস্যময় অধ্যায়ের আবরণ উন্মোচন করা সম্ভব হতে পারে। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরবর্তী সংবাদও শীঘ্র হয়তো পরিবেশন করা হবে। ডাক্তার মরিসন প্রতীক্ষা করছিলেন সংবাদটির জন্য। কিন্তু অনেকদিন চলে গেলেও যখন তেমন কোন সংবাদ আর প্রকাশিত হলো না, তখন অধীর হয়ে তিনি পত্রিকা-অফিসে খোঁজ নিতে গেলেন।

সেখানে প্রত্যাশিত কোন খবর না পেয়ে তিনি ঠিক করলেন, পরবর্তী সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা না করেই তিনি সদলে আফ্রিকা যাত্রা করবেন। তবে তাঁর যাত্রা বড় সহজ ব্যাপার নয়, কারণ গবেষণার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। পুরাদস্তুর একটি গবেষণাগার আফ্রিকার অরণ্যে স্থাপন করতে হবে—তার জন্য উপযোগী জিনিসপত্র, লোকজন, টাকা-পয়সার ব্যবস্থা চাই



কুমিরটার পিঠে চেপে বসে চোখ দুটো তার আঙুল দিয়ে টিপে ধরল।

আগে। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে বহু বৈজ্ঞানিক এগিয়ে এলেন। ধীরে-সুস্থে যাত্রার আয়োজন চলতে লাগলো।

এমন সময় অকস্মাৎ প্রভাতী পত্রিকায় প্রকাশিত হলো বহু-প্রত্যাশিত সেই সংবাদ। কিন্তু সে-সংবাদ পড়ে ডাক্তার মরিসন দমে গেলেন। ইংরেজ-দুহিতা নোরার ও পশু-মানব টারজানের পলায়ন-কাহিনী সাড়ম্বরে পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর ইংরেজ-সমাজে হুলুস্থুল পড়ে গেলেও ডাক্তার মরিসন ভাবছিলেন, এক অপূর্ব সুযোগ তিনি বুঝি চিরকালের জন্য হারালেন। কিন্তু পরে সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর সঙ্গে তিনিও কণ্ঠ যোগ করে বলে উঠলেন—নোরার উদ্ধার-সাধন এবং টারজানের বন্ধন চাই-ই।

দ্বিগুণ উৎসাহে ডাক্তার মরিসন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন এবার তাঁর সুবিধা হলো অনেক বেশি; কারণ, ইংরেজ-সমাজের আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারও নোরার উদ্ধার-সাধনে সহায়তা করতে রাজী হলেন। ডাক্তার মরিসনের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী অভিযানের জন্য তৈরী হলো। একখানা জাহাজ, প্রচুর সঙ্গী, রসদ, যন্ত্রপাতি এবং প্রচুরতর অর্থ নিয়ে বাহিনী শুভক্ষণে ইংলণ্ডের উপকূল ত্যাগ করলো।

বনের বিভীষিকা

টারজানের নতুন জীবন শুরু হলো। অল্পদিন রিচার্ডের শিবিরে থাকা ছাড়া তার বাকী জীবনই কেটেছে অরণ্যে অরণ্যে। বৃক্ষশাখা, পর্বতগুহা কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তর তার নিকট এতকাল সবই ছিল সমান। খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, যেখানে রাত হয় সেখানে শয়ন, যখন ক্ষিদে

পায় তখনই ভোজন, এই ছিল তার দিন-চর্চ্চা। কিন্তু শিবিরে অবস্থান তার অল্পদিনের জন্য হলেও এর প্রভাব টারজানের উপর পড়েছিল অনেকখানি। বিশেষতঃ নোরা এখন তার সঙ্গী—নোরার প্রাণপণ প্রচেষ্টা যাতে টারজান স্বাভাবিক মানুষের মত জীবন যাপন করে অবশ্য চেষ্টা করলেও যে টারজান এত শীগ্‌গির নিজের স্বভাব শুধরাতে পারবে সে ভরসা নেই। তবু টারজানের আচার-ব্যবহার থেকে মনে হয়, সে নোরাকে খুশী করবার জন্য অন্ততঃ যথাসম্ভব তার নির্দেশ-অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করে।

কিন্তু কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে'—এত দীর্ঘ দিনের অভ্যাস কি আর সহজে দূর হয়? তাই যেদিন কাঁচা মাংস চিবোতে চিবোতে টারজান এসে গুহায় ঢুকলো সেদিন নোরা চেঁচামেচি করলো খুব; তারপর অভিমান করে কথা বন্ধ রাখলো অনেকক্ষণ। শিবিরে থাকার সময় টারজানের সুপ্ত অনুভূতিগুলো আত্ম-প্রকাশের কিছুটা সুযোগ পেয়েছিল—এখন তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই এরপর থেকে সে সত্যাই কাঁচা মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

দিন যায় ঠিক কিন্তু নোরার দিন যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। টারজান যে সময়টুকু গুহায় থাকে, ততক্ষণ সে টারজানকে শুধু কথা এবং সভ্যভব্য আচরণ শেখাবার চেষ্টা করে। আর টারজান যখন বাইরে যায়, তখনই তার মাথায় এসে ঢোকে যত রাজ্যের চিন্তা! যখনই ভাবতে বসে, এই অরণ্যে এক পশু-মানবের সঙ্গে তাকে দিন কাটাতে হবে, তখনই দুঃখে আতঙ্কে তার চোখে জলের ঝর্ণা নামে। মাঝে মাঝে পালিয়ে যাবার কথাও তার মনে জাগে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই—ভাবনায় আর এগুনোর পথ পায় না। কারণ যে নিবিড়

অরণ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে তাদের শিবির খুঁজে বার করা অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তার চেয়ে সাংঘাতিক—এখান থেকে বেরুলেই মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। কারণ, এই হিংস্র, শ্বাপদ এবং বিষাক্ত সরীসৃপ-সঙ্কুল অরণ্যে টারজান ছাড়া কোন দ্বিতীয় মানব-সন্তানের পক্ষে বিচরণ অসম্ভব এবং অভাবনীয়। মৃত্যু যেন ওৎ পেতে আছে! কাজেই পলায়নের চিন্তা নোরার মন থেকে বিসর্জন দিতে হয়।

টারজান অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে—ঘরে একলা বসে নোরা। হাতের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এ তো সভ্য জগৎ নয়—কাজেই রান্নাবান্নার হাঙ্গামা বিশেষ নেই। নোরার দিন কাটে ফলমূল খেয়েই। অবশ্য টারজানই সব যোগাড়যন্ত্র করে এনে দেয়। নোরার পক্ষে গুহার বাইরে আসা যে নিরাপদ নয়, প্রাণ-রক্ষার স্বাভাবিক তাগিদ থেকেই হয়তো টারজান তা' বুঝে নিয়েছে—নোরাও ভয়ে বাইরে বেরুতে পারে না।

সেদিন ঘরে বসে তাই সমস্ত ভাবনা-চিন্তা বিসর্জন দিয়েই সে একমনে কাজ করছিল—কাজ অবশ্য বিশেষ কিছু নয়, পাথর ঘষে ঘষে তা' দিয়ে অস্ত্র তৈরী করা।…হঠাৎ ফোঁশ্ ফোঁশ্ শব্দে চম্‌কে তাকিয়ে দেখে, বিরাটদেহ এক অজগর গুহার মুখে গর্জন করছে। ইংরেজ-তনয়া নোরা ষ্টিম-এঞ্জিনের শব্দ শুনেছে কিন্তু তারও বুঝি এমন ফোঁশ্-ফোঁশানি নেই। ভয়ে নোরার বুক কেঁপে উঠলো, মুখ শুকিয়ে গেল। অকল্পিত এই আক্রমণের জন্য নোরা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। গুহায় এমন কোন অস্ত্র নেই, যা দিয়ে এই পরম শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে। তার হাতে যে পাথরের টুক্‌রো, তার আঘাতে এই নাগরাজের দেহে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য জাগবে না। চকমকি ঠুকে যে



আগুন জ্বালাবে, সে শক্তিও তার দেহে আর অবশিষ্ট নেই। মৃত্যু একান্ত আসন্ন বুঝে সে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলো।

ধীরে ধীরে এগুচ্ছে মৃত্যু-দূত। হয়তো রেখে-ঢেকে রয়ে-বসে

দেখে-শুনে খাবার জন্যই তার এই মন্থরতা। অজগরের চোখ দুটোতে যেন মানিক জ্বলছে। সেই চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে নোরার সর্বদেহ অবসন্ন হয়ে এলো। কিসের একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ যেন তাকে সর্পরাজের মুখের দিকে ঠেলে দিতে লাগলো! চীৎকার তার বন্ধ হয়ে গেল। নীরবে সে নিজের দেহকে মৃত্যু-দূতের হাতে সঁপে দিচ্ছে। বুঝি ভাবনা-চিন্তার এতটুকু শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। আর একটু মাত্র—তারপর চিরকালের মতো তাকে হয়তো চোখ বুজতে হবে! সাপের মুখে পড়বার আগেই প্রাণ বুঝি বেরিয়ে যাবে!

এ কী! সাপটা তো আর এগুচ্ছে না! এগুবার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টায় দেহাগ্রভাগ বারবার সঙ্কুচিত প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু নোরার সঙ্গে তার ব্যবধান আর কমছে না। অকস্মাৎ এক বিকট চীৎকারে অর্ধচেতন নোরার দেহে যেন চেতনা জাগলো! এ তার বহু-পরিচিত কণ্ঠ—টারজানের কণ্ঠ—হাতীবন্ধুর উদ্দেশে তার কাতর আহ্বান!

নাগরাজের কোঁশ্‌ফোঁশানি বেড়ে গেছে, কিন্তু একতিল এগুচ্ছে না! যন্ত্রণায় যেন মাঝে মাঝে সমস্ত দেহ মোচড়াচ্ছে, কখনো বা একটু করে পিছনে গিয়ে আবার এগুবার চেষ্টা করছে। নোরার ভয় তখন উবে গেছে, সকৌতুকে সে সর্পরাজের দুরবস্থা নিরীক্ষণ করছে। কিন্তু বাইরে কি হচ্ছে, বুঝতে পারলো না। তবে বাইরে যে কোন একটা শক্তি এটাকে ভিতরে আসতে বাধা দিচ্ছে, তা সে বুঝতে পেরেছে।

অকস্মাৎ শোনা গেল দুপ্‌দাপ্‌ আওয়াজ—অরণ্যে বেশ তোলপাড় সুরু হয়েছে! মুহূর্ত মাত্র—তারপর কী এক অসহ্য যাতনায় নাগরাজের সমস্ত দেহ কুঁকড়ে গেল। রোষে সে আথালি-পাথালি করছে অথচ নিরুপায়—একটু এগুতে পারছে না! খানিক বাদেই নোরা সবিস্ময়ে

দেখতে পেলো নাগরাজ যেন পিছু হঠছে, কিন্তু অজগর তো কখনও এমনভাবে চলে না। তবে কি, তবে কি—হ্যাঁ, নোরার অনুমান সত্য। গুহামুখ থেকে নাগরাজ সরে যেতেই এগিয়ে এসে নোরা দেখে, হাতীবন্ধু শুঁড় জড়িয়ে ধরে নাগরাজকে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে টারজান। সব ব্যাপার পরিষ্কার হলো।

টারজান গুহার দিকেই ফিরছিল, এমন সময় নোরার চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখে—এক বিরাট অজগর গুহায় ঢুকছে। টারজান চট্ করে অজগরের লেজটা একটা গাছের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে তার হাতীবন্ধুকে আহ্বান জানালো। ঐ সময়ই অজগর বারবার চেষ্টা করেছে ভিতরে ঢুকতে। কিন্তু টারজানের বন্ধন এড়িয়ে এক চুলও এগুতে পারেনি। ইতিমধ্যে হাতীবন্ধু এসে অজগরের কোমরের উপর দিলে তার বিপুল দেহের চাপ—অজগর কুঁকড়ে গেল। কোমর তার ভেঙ্গে গেছে—নড়বার আর শক্তি রইলো না। তখন গজরাজ সেটাকে টেনে বের করলো।

টারজানের কবলে সানি

একমাত্র সানির কথা ছাড়া নোরার বেঁচে থাকার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণই মিষ্টার রিচার্ড কিংবা উইলসন-দম্পতি পাননি। কিন্তু সানি এমন নিশ্চিতভাবে টারজানের কণ্ঠ শুনেছে যে, এ সম্বন্ধে কেউ কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে সে মহা খাপ্পা হয়ে ওঠে। মিঃ রিচার্ড এবং আর্থার উইলসন সদলে অরণ্যে অনেকবার হানা

দিয়েছেন, কিন্তু নোরা তো দূরের কথা, টারজানের পর্যন্ত কোন হদিশ পাননি। অগত্যা তাঁরা নোরার আশা প্রায় ছেড়েই দিলেন, কিন্তু সানি তখন বুক ঠুকে বল্লো যে, যদি টারজান আর নোরাকে খুঁজে বার করতে না পারে, তবে আফ্রিকার এই নিবিড় অরণ্যেই সে দেহপাত করবে,—সভ্য-জগতে আর ফিরে যাবে না। তখন সকলে উৎসাহিত হয়ে আবার নতুন করে অভিযান চালাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এর মধ্যে ডাক্তার মরিসনের এক চিঠি এসে রিচার্ডের শিবিরে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যপুষ্ট বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের অপ্রত্যাশিত আগমন-সংবাদে হৃত-সন্তান রিচার্ড এবং ডাক্তার-দম্পতির মনে নতুন করে আশার সঞ্চার হলো। শিবিরের প্রত্যেকে আনন্দোৎফুল্ল, শুধু সানিই খুশী হতে পারেনি। কারণ তার মনে হলো, তার জয়ে অপরে ভাগ বসাতে চায়। তাই তার প্রাণপণ চেষ্টা হলো যাতে ডাক্তার মরিসন আসবার পূর্বেই সে টারজান আর নোরাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র হয়ে সে একাই বেরিয়ে পড়ে তাদের সন্ধানে। মিঃ উইলসন ওর মনোভাব বুঝতে পেরে ওকে সতর্ক করে দিলেন যে এভাবে একলা বেরিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিলে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। অগত্যা সানির একলা বেরুনো বন্ধ হলো।

পরামর্শ-সভা বসেছে—কী উপায়ে ওদের সন্ধান পাওয়া যায়। এক বিষয়ে সকলেই একমত, যতখানি সম্ভব সমগ্র অরণ্যে তল্লাসী চালাতে হবে। ঠিক হলো, এক এক দিন এক একটা অঞ্চল

ফেরতে হবে। টারজান হয়তো গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু নোরা যদি বেঁচে থাকে, তবে তার জন্যে নিশ্চিত একটা আস্তানা তৈরী করতে হয়েছে—সে আস্তানা খুঁজে বার করাই হলো অভিযাত্রিদলের প্রথম লক্ষ্য।

দলের লোকসংখ্যা নেহাৎ কম না হলেও আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যে এই শক্তি নিয়ে প্রবেশ দুঃসাহসিকতার পরিচয়। বিশেষ শিবির রক্ষার জন্যেও একটা দলকে সেখানে রাখা প্রয়োজন। তাই কাছেই বাণ্টুদের গ্রাম থেকে ক'জন বলিষ্ঠ যুবক আমদানী করা হলো। কিছুটা মদের লোভে আর কিছুটা শিকারের লোভে সাগ্রহে তারা মিষ্টার রিচার্ডের দলে যোগ দিল।

সকালবেলা প্রাতরাশ সম্পন্ন করে অভিযাত্রিদল অরণ্যে প্রবেশ করে, আর ফিরে আসে বিকেলের দিকে। তারপর আহারাদি সেরে বসে পরামর্শ-বৈঠক। একদিন যখন বৈঠক বসেছে, তখন সকলকে চমকে দিয়ে—বহু দূর থেকে ভেসে আসে এক কণ্ঠ! যারা টারজানের কণ্ঠস্বর শুনেছে তাদের বুঝতে দেরী হলো না যে এ টারজান ছাড়া আর কেউ নয়। সকলে কান পেতে রইলো—কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে।

পরের দিন তারা টারজানকে গ্রেপ্তার করবার পণ করে বেরুলো। সঙ্গে নিলো প্রচুর খাদ্য এবং মশাল। প্রয়োজন হলে রাত্রেও তারা অরণ্যে তল্লাসী করবে। অভিযাত্রিদল হৈ-হৈ শব্দে বন্য জন্তুদের আগে থেকেই সাবধান করে দিতে দিতে এগোয়। কারণ মিষ্টার রিচার্ডের মনে ক্ষীণ আশা ছিল তাঁদের সাড়া পেলে নোরাও হয়তো এগিয়ে আসতে পারে।



টারজান দুহাতে তার একটা পা ধরে সবেগে ঘুরাতে লাগ্‌লো..

সারাদিনের অভিযান প্রায় অন্যদিনের মতো বৈচিত্র্যহীন ভাবেই কাটলো। হঠাৎ বিকেলের দিকে ঘট্লো অঘটন। কাছাকাছি কোথায় টারজানের কণ্ঠ শোনা গেল। খানিক বাদে তাদের অবাক্ করে দিয়ে বিদ্যুতের মতো টারজান একবার দেখা দিয়েই কোথায় লুকালো। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। আনন্দের উত্তেজনায় তাদের সতর্কতা কিছু শিথিল হলো ; তাদের অনেকেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়লো।

অকস্মাৎ শোনা গেল এক গরিলা-শিশুর চীৎকার। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল অভিযাত্রিদল। মুহূর্তে তারা ঘিরে ফেললো গরিলা-শিশুকে। হাতে হাতে মশাল জ্বলে উঠ্লো—গরিলা-শিশু অগ্নি-বেষ্টিত হয়ে ধরা দিলো, অবশ্যি সামান্য জখমও হলো। আনন্দে অভিযাত্রিদল আত্মহারা ! টারজানকে না পেলেও যেন তাদের শ্রম কিছু সার্থক হয়েছে—সকলের চোখেমুখে আনন্দের ভাব প্রকাশ পেলো।

সানি কিন্তু অভিযাত্রিদের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি—সে শান্ত ভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে টারজানকে। সবাই যখন গরিলা-শিশুকে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করছে, সানি তখন তাদের চেয়ে কিছু দূরে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে—হাতে তার অস্ত্র, চোখে দীপ্তি, মনে স্বপ্ন। হয়তো মুহূর্তের জন্য সে অসতর্ক হয়েছিল—অকস্মাৎ পেছন থেকে সে যখন আক্রান্ত হলো, তখন আত্মরক্ষার কথা ভুলে গিয়ে সে যেন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইলো। মুহূর্তের মধ্যেই সানি টারজানের হাতে বন্দী হলো। তার কণ্ঠস্বরও বেরুলো না, টারজানের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে একটি অঙ্গুলিও উদ্যত হলো না ; শুধু আড়নয়নে সে



টারজানের হাতে বন্দী সানি

তাকিয়ে রইলো। টারজান তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে চকিতে উধাও হলো।

আনন্দোল্লাস করতে করতে অভিযাত্রিদল যখন গরিলা-শাবককে নিয়ে শিবিরে এসে পৌঁছুলো, তখন সবার খেয়াল হলো—সানি অনুপস্থিত। ডাক্তার-দম্পতি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

তখন বেশ রাত হয়েছে। কাজেই রাতের এই অন্ধকারে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করে সানিকে খোঁজা কেউ-ই যুক্তিসংগত মনে করলো না। কারণ, এতে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ তো হবেই, অধিকন্তু আরো কেউ কেউ-ও হারিয়ে যেতে পারে। তাই পরামর্শক্রমে ঠিক হলো—রাত্রিটা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে পরদিন নূতন শক্তি নিয়ে তারা সানিকে খুঁজে বার করবে। তাদের ধারণা হলো, ঘুরতে ঘুরতে সানি হয়তো একলা পড়ে গিয়েছিলো—তাই তাদের সঙ্গে ফিরতে পারেনি। আর তার জন্যে ভয়েরও তেমন কিছু নেই, সঙ্গে পিস্তল রয়েছে।—তবে একটা ভাবনা তাদের পেয়ে বসলো—দলচ্যুত সানি পিস্তলের আওয়াজ করে তাদের সংকেত জানালো না কেন? এর কোন সদুত্তর অবশ্য কেউ-ই দিতে পারলো না।

তৃতীয় পর্ব

অভিসন্ধি ও সাফল্য

সানির স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকারের পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে অবশ্য উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে লড়তে পারতো—কিন্তু টারজানের হাত থেকে নিস্তার পেতো কিনা সন্দেহ; সে চীৎকার করে অন্যদের দৃষ্টি এদিকে ফিরাতে পারতো, কিন্তু এতে সে নিজে উদ্ধার পেলেও টারজানের নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য হতো। তাই সে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করে টারজানের আস্তানার খোঁজ নেবার জন্যেই অধিকতর উৎসুক হয়ে উঠে। অবশ্যি এতে তার প্রাণহানিরও আশঙ্কা রয়েছে, কিন্তু সে তো জীবন কবুল করেই এ কার্যে ব্রতী হয়েছে। তাই টারজান যখন তাকে কাঁধে করে নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল, তখন সে চুপ করে শুধু পথের প্রতিই দৃষ্টি রাখছিল।

টারজান যখন অভিযাত্রিদের কাছ থেকে একটা নিরাপদ দূরত্বে উপনীত হলো, তখন ধপ্ করে সানিকে কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলে দিল। সানির দেহে কিছুটা আঘাত লাগলেও সে চুপ করে সয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাটি থেকে উঠে বসলো। সানির মতো বিরাটদেহ বলিষ্ঠ কাফ্রীসন্তানকে এতটা পথ কাঁধে করে বয়ে এনে টারজানও যথেষ্ট শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সে খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার যখন সানিকে কাঁধে তুলতে চাইলো, তখন সানি আর তার কাঁধে না উঠে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চল্লো। শুধু টারজানের অজান্তে পিস্তলটা

নিজের কোমরে গুঁজে নিলো। অনেকটা পথ হাঁটবার পর তারা একটা গুহামুখে এসে পৌঁছালো।

টারজান সেখানে থেমে ডাকলো—"নোরা!"

টারজানের মুখে মানুষের ভাষা শুনে সানি বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল। সে বুঝতে পারলো—নোরা এখানে এসে টারজানকে মানুষ করবার সাধনায় ব্রতী হয়েছে। নোরা ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে টারজানের সঙ্গে সানিকে দেখে আনন্দে আর বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলো। বুঝি বা মুক্তি তার আসন্ন—এই ভেবে মুহূর্তের মধ্যেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। নোরার এই ভাবান্তর টারজানের ভাল লাগলো না। সে বিকট এক চীৎকার করে মুহূর্তের মধ্যে ছুটে পালালো।

নোরা পেছন থেকে ডাকলো—"টারজান, টারজান!" কিন্তু কে শোনে কার কথা? টারজান ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার জন্যে নোরার মনে খানিকটা দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হলেও আপাততঃ সানির কাছে তার বাবার আর শিবিরের অন্যান্যদের খোঁজ-খবর নিতে লাগলো।

দূর থেকে শোনা যেতে লাগলো টারজানের চীৎকার—সে তার হাতীবন্ধুকে ডাকছে। নোরা বুঝতে পারলো, হাতীবন্ধুকে কাছে পেয়েই টারজান তার মনের জ্বালা ঘুচাবে।

অকস্মাৎ নোরার খেয়াল হলো—এই নিবিড় অরণ্যে টারজান ছাড়া সে কী ভাবে রাত্রিযাপন করবে? ভয়ে তার প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম হলো। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন বন্য জন্তু গুহায় প্রবেশ করতে পারে। সানির কি এত শক্তি আছে

যে বন্য জন্তুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে? নোরার মনের ভাব বুঝে সানি তাকে আশ্বাস দিলো যে, তার হাতে পিস্তল আছে—কাজেই আপাততঃ ভয়ের কোন কারণ নেই। নোরার মনে তখন শুধু টারজানের জন্যেই দুর্ভাবনা জেগে রইলো।

সাথীসহ শিবিরে হানা

অভিমানাহত টারজান শাঁখের মতো করে মুখের কাছে আঙুল নিয়ে বিকট আওয়াজে ডাক দিলো তার দুদিনের বন্ধু গজরাজকে। গজরাজ তখন এক কদলীবনে অপর এক গজনন্দনের শুঁড়ে শুঁড় জড়িয়ে তাকে কুস্তীর প্যাঁচ শেখাচ্ছিল। যেমনি টারজানের আহ্বান শুনতে পেলো, অমনি পড়ি-কি-মরি করে দিল ছুট। কোথায় রইলো গজনন্দন আর কোথায় রইলো রাতের ঘুম। বনবাদাড় ভেঙ্গে ছুটছে গজরাজ; মাঝে মাঝে শুঁড় তুলে চীৎকার করে বন্ধুকে জানাচ্ছে যে, সে এক্ষুণি এসে পৌঁছাচ্ছে।

পথে এক চিতা ওৎ পেতে ছিল শিকার ধরবার জন্য, শিকারের দিকেই ছিল তার দৃষ্টি; তার পিছন দিক দিয়ে যে সাক্ষাৎ যমরাজ এগিয়ে আসছে, সে খেয়ালই ছিল না। গজরাজের পায়ের চাপে সে হতভাগা মৃত্যু বরণ করলো। গজরাজের অবিশ্যি সে দিকে খেয়াল ছিল না—সে উন্মত্তের মতো ছুটে চলছিল টারজানের কাছে। হঠাৎ পায়ের নীচে একটা নরম কী ঠেকতে সে তাকিয়ে দেখলে, একটা চিতাবাঘ একেবারে চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। শুঁড় দিয়ে ওর দেহটাকে তুলে খানিক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চললো গজরাজ।

টারজানের সঙ্গে দেখা হতেই সে কি আকুলিবিকুলি। গজরাজ

টারজানকে জড়িয়ে ধরেছে শুঁড় দিয়ে আর টারজান তার শুঁড় জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে। বন্য পশু আর বন্য মানব—দুই বন্ধুতে হলো মনের আদান-প্রদান।

টারজান অবাক হয়ে গিয়েছিল নোরার এই উল্লাস প্রকাশে। সানি—সেই কালো মানুষটা—যাকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না, তাকে দেখে কেন নোরা এতটা উতলা হবে ? নাঃ, সে ভুলই করেছে। সানির গলাটা টিপে ধরলেই তার উপযুক্ত শিক্ষা হতো! কিন্তু শিক্ষা দিতেই হবে—শুধু সানিকে নয়, তার জাতভাই সব গুলোকেই, শিবিরে যতগুলো মানুষের বাচ্চা আছে,—সবাইকে দিতে হবে শিক্ষা। হাতী-বন্ধুর সঙ্গে সেই পরামর্শই হলো। গজরাজ চলে গেল হেলে দুলে।

টারজান তখন একটা গাছের ঝুরি বেয়ে উপরে উঠে চারদিকে তাকালো। কিন্তু অন্ধকারে দৃষ্টি খুব বেশী এগুলো না, খানিক কান পেতে রইলো সে। মনে হলো, কোথায় অনেক দূরে যেন সে একটা কিছু ইঙ্গিত পাচ্ছে। গেঁজেয় হাত দিয়ে দেখলো—পাথরের তৈরী ছুরিটা ঠিকই আছে। তারপরই একটা ঝুরি ধরে সে এগিয়ে গেল প্রায় চল্লিশ হাত দূরে একটা গাছে। সেখানে ঝুলছিল আর একটা ঝুরি। দু'হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরে আগের ঝুরিটা যেমনি সে ছেড়ে দিয়েছে, অমনি সে ঝুরিটাই আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরলো তাকে। মুহূর্তে সচেতন হয়ে গেঁজ থেকে ছুরিটা বার করে সে ঝুরিটা আর নিজের মাঝখানে গুঁজে দিল! সঙ্গে সঙ্গে দেহের ফাঁস ঢিলে হয়ে গেল। আর সুরুৎ করে টারজান গলিয়ে নীচে পড়ে গেল। ওঃ—কি রক্ষেটাই না পেলো! অন্ধকারে ঝুরি ভেবে সে অজগরের লেজ জড়িয়ে ধরেছিল। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি!

কিন্তু ভাবনা-চিন্তার আর সময় নেই। সে আর একটা ঝুরি ধরে চল্লো এগিয়ে এমনি ভাবে সে গিয়ে পৌঁছালো যেখানে গরিলার দল বসে বৈঠক করছে। সে এক মহা হুলুস্থুল কাণ্ডকারখানা। কতকগুলি অপদার্থ মানব-সন্তান এসে একটা জ্যান্ত গরিলা-শাবককে ধরে নিয়ে গেছে—এ অপমান তারা চোখ বুজে সইতে পারবে না। ধৃত গরিলা-শাবকের মা শুধু দু'হাতে বুক চাপড়াচ্ছে আর দলের সর্দার চুপ করে কী যেন ভাবছে।

টারজানকে দেখেই সবাই উল্লসিত হয়ে উঠলো এবং চীৎকার করে তাদের সংবর্ধনা জানালো। টারজান হাতের ইঙ্গিতে তাদের চুপ করিয়ে দিয়ে সর্দারের সঙ্গে বসে খানিক পরামর্শ করলো। তারপর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যখন তা' গরিলা-মহলে প্রচার করা হলো, তখন সেখানে তুমুল কলরোল উত্থিত হলো। বোঝা গেল, সবাই এ সিদ্ধান্তে আনন্দিত হয়েছে, এবং এটাকে অনুমোদন করছে।

টারজান আবার এক নিমেষে উধাও হয়ে গেল। গরিলা-সর্দার সদলবলে হানা দিলো মিঃ রিচার্ডের শিবিরে। কিছু দূরে দেখা গেল, গজরাজের পৃষ্ঠে বিরাট-দেহ টারজান গরিলাদলকে উৎসাহিত করছে। গরিলাদের অতর্কিত আক্রমণে শিবিরে কোলাহল পড়ে গেল। একে তো অন্ধকার, তায় আবার বাঘ নয়, ভালুক নয়—বনমানুষ, মানুষেরই মতো প্রায় আকার! আবছা আলোতে কাফ্রীতে আর গরিলায় প্রভেদ বোঝা দুষ্কর। কাজেই শত্রুমিত্র ভেদে অসমর্থ শিবিরবাসীরা ভয়ে আতঙ্কে শুধু চীৎকার করতে লাগলো।

শুধু মিঃ আয়রনসাইডই বিপদে অধীর না হয়ে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কারে সচেষ্ট হলেন। তিনি পিস্তল বাগিয়ে ধরে শিবিরের বাইরে



গজরাজের পায়ের চাপে সে হতভাগা মৃত্যুবরণ করলো

এসে স্তূপীকৃত শুক্‌নো খড়কুটোয় আগুন ধরিয়ে দিলেন। মুহূর্তে শিবির এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। শিবির-বাসীরা এবার ভয় কাটিয়ে উঠে হাতিয়ার নিয়ে বন্য-পশুদের আক্রমণ করলো।

ইতিমধ্যে গরিলাদের আক্রমণে কয়েকজন জখম হয়ে পড়েছে—এরা সবাই কাফ্রীসন্তান; তাই জখম হলেও একেবারে হতাশ হয়ে পড়েনি। গরিলার দল যখন বুঝলো তারা এবার বে-কায়দায় পড়ে গেছে, তখন পিছু হটতে লাগলো। কিন্তু সে পথও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে—শিবিরের চারিদিকে অগ্নিবেষ্টনী রচিত হয়েছে, কাজেই বাইরে যাবার সোজা কোনো উপায় নেই।

প্রাণের দায়ে এবার গরিলারা পরিত্রাহি বলে চেঁচাতে লাগলো, তার সঙ্গে মিশলো শিবিরবাসীদের উন্মত্ত কলকোলাহল, নিথর নিশীথের বুকে জাগলো কম্পন। আনন্দ আর আতঙ্কের কলকোলাহল অরণ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তারই তরঙ্গ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মুখর করে তুললো অরণ্যকে। নিশীথের স্তব্ধতা ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে পড়েছে। দূর থেকে টারজান গরিলাদলকে ফিরে আসবার আহ্বান জানাচ্ছে—কিন্তু পথ কোথায়? গরিলাদল উন্মত্তের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলো। শিবিরবাসীরা কেউ কেউ পিস্তল আর বন্দুক হাতে, কেউ বা তলোয়ার আর বল্লম নিয়ে সুবিধা মতো ওদের আঘাত করছে, কখন বা আত্মরক্ষায় মন দিচ্ছে। এই কলকোলাহলের মধ্যে কখন কী ভাবে অকস্মাৎ একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করলো শিবিরের আচ্ছাদন। শিবিরের এক অংশে দেখা গেল আগুনের

লেলিহান শিখা—মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো শিবির।

আবার শুরু হলো কোলাহল। শিবিরবাসীরা আত্মরক্ষার তাগিদে কেউ বা শিবিরের অগ্নিনির্বাপণে ব্যস্ত হলো, আর কেউ বা অগ্নিবেষ্টনী ভেদ করে তার মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার পথ তৈরী করে নিলো। গরিলাদল আত্মরক্ষার এই সহজ সুযোগ পরিত্যাগ না করে চট করে বেরিয়ে এলো বাইরে, আর মুহূর্ত মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল অরণ্যের অন্ধকারে।

সারারাত চেষ্টা করে শিবিরের আগুন নেভানো হলো বটে—কিন্তু তাদের ক্ষতি যা হলো, তা অপূরণীয়। জিনিসপত্র কিছু কিছু বাঁচানো সম্ভবপর হলেও অধিকাংশই হয়েছে বিনষ্ট। জন-মানুষের আরাম-বিহীন এই অরণ্যানীর বুকে একটা আচ্ছাদন ছাড়া বাস করা নিশ্চয়ই দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। কাজেই প্রথমেই শিবিরবাসীদের চিন্তা হলো—অতঃপর কী করা কর্তব্য। তাদের লোকক্ষয় বিশেষ হয়নি বটে, কিন্তু অবলম্বনহীন ভাবে এখানে বাস করার সার্থকতাই বা কি! গরিলারা যে কয়জন কাফ্রীকে আঘাত করেছিল, তাদের আঘাতও তেমন গুরুতর নয়—অল্পেই হয়তো সেরে উঠবে। কিন্তু তাঁবু পুড়ে গেছে, জিনিসপত্রও অনেক নষ্ট হয়েছে—এ অবস্থায় সুসভ্য ইংরেজ সন্তান বাস করে কী ভাবে? খাদ্য অবশ্য এখানে জুটতে পারে—কিন্তু সভ্যতার সর্ব উপাদানবর্জিত অবস্থায় অরণ্যজীবন যাপন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই অধিকাংশের মত হলো অবিলম্বে এ অঞ্চল ত্যাগ করে তারা যাবে নাইরোবি শহরে তারপর তৈরী হয়ে আবার আসবে নোয়া আর টারজানের উদ্ধার-চেষ্টায়।

টারজান যে বেঁচে আছে, তা অবশ্যি সবাই দেখেছে—কিন্তু নোরার তো কোন পাত্তা এখনও পাওয়া গেল না। অধিকন্তু তাদের অকৃত্রিম সুহৃদ সানিও হয়েছে নিরুদ্দেশ। কাজেই এখানে অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। মিঃ রিচার্ড, ডাঃ উইলসন ও মিঃ আয়রন-সাইড—সবাই একবাক্য স্বীকার করলেন যে, আপাততঃ নাইরোবি শহরে গিয়ে তৈরী হয়ে ফিরে আসাই যুক্তিসংগত। ফলে, তাদের গোছগাছ শুরু হয়ে গেল।

মুক্তি পথে

শিবিরের কলকোলাহল অরণ্যানীর নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে সুদূর পর্বতকন্দর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। সহসা অপ্রত্যাশিত এই কোলাহলধ্বনি নোরার মনে চমক জাগালো—এমন তো কোনদিন হয় না! তার মনে হলো, অভিমানাহত টারজান এর সঙ্গে জড়িয়ে নেই তো? সানি তাকে চঞ্চল করে তুল্লো এই বলে যে, শুধু গরিলার নয়, মানুষের আর্তকণ্ঠও এর সঙ্গে শোনা যাচ্ছে! ফলে ছু'জনেরই মনে হলো, নিশ্চয়ই শিবিরে কোন কিছু ঘটেছে।

নোরা দৌড়ে বেরিয়ে এলো গুহা থেকে, সানিও তার অনুসরণ করলো। কিন্তু আর একটু স্পষ্ট আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছুই তারা বুঝতে পারলো না। নোরা অস্থির হয়ে উঠেছে। সানি তাকে আশ্বাস দিয়ে এক উঁচু গাছের মগডালে চড়লো এবং সেখান থেকে দেখতে পেলো, শিবিরে আগুন লেগেছে।

তার মাথায় চকিতের মধ্যে বুদ্ধি এলো—এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ

আগুন দেখে দেখেই এ ব্যূহ ভেদ করে তারা শিবিরের পথ খুঁজে বার করতে পারবে। জীবনে হয়তো দ্বিতীয়বার এই সুযোগ না-ও আস্‌তে পারে।—আর হয়তো টারজানও বন্দী হয়েছে শিবিরে। কাজেই এই সুযোগে না বেরুলেই নয়। ভয়, শুধু অরণ্য-পশুর। কিন্তু এজন্য ঘাবড়ানোর কিছু নেই ; কারণ টোটা-বোঝাই পিস্তল আর কয়েকখানা ছুরি তো সঙ্গেই আছে।

কী জানি কি ভেবে নোরাও স্বীকৃত হয়ে পথে পা দিল।

চতুর্থ পর্ব

মরিসনের সৌভাগ্য

ডাক্তার মরিসন যখন সদলবলে রুয়েঞ্জারী পর্বতমূলে উপস্থিত হলেন, তখন সেখানে পেলেন ভস্মস্তূপ আর ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্র। যে সীমাহীন আশা নিয়ে ডাক্তার এসেছিলেন, মুহূর্তে সে আশায় ছাই পড়লো। বুঝতে পারলেন, মিঃ রিচার্ড এবং তাঁর দলবল অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে পর্বত-মূল ত্যাগ করেছেন; এবং তাঁরা যে আশ্রয়ের আশায় নাইরোবির দিকে যাত্রা করেছেন, এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিত হলেন। ভস্মস্তূপ এবং ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্র পরীক্ষা করেই ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন, নিদারুণ কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, অভিযাত্রি-দল স্বেচ্ছায় স্থানত্যাগ করেছেন শুধু আশ্রয়ের সন্ধানে।

থাক্‌গে, বেশী ভাবনার সময় ছিল না—তাঁরা এই পরিত্যক্ত স্থানেই আবার শিবির সন্নিবেশে উদ্যোগী হলেন; আর কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেন নাইরোবির দিকে—যারা মিঃ রিচার্ডের সন্ধান নেবে এবং সম্ভবপর হলে তাঁদের ফিরিয়ে আনবে।

ডাক্তার মরিসন তাঁবু খাটানোর আদেশ দিয়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে অরণ্য পর্যবেক্ষণে বের হলেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন তাঁর পক্ষে অরণ্যের অলিগলির সন্ধান নেওয়া অত্যাবশ্যক। তিনি তাই এদিক-সেদিক ঘুরে দেখছেন—অকস্মাৎ অভাবিত এক চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকলো। মিঃ রিচার্ড ও ডাক্তার উইলসন, টারজান আর নোরাকে উদ্ধার করে চলে যাননি তো? কে জানে? যদি তাই হয়—তবে তো এখানে তাঁবু খাটানো আর অরণ্য-পর্যবেক্ষণ

উভয়ই হবে মূল্যহীন। তবে কি মিঃ রিচার্ড-এর খবর না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন? কিন্তু ডাক্তার মরিসন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবার লোক নন—তাঁর কাজ তিনি করেই যাবেন। তিনি অরণ্যের অলিগলির সন্ধান শুরু করে দিলেন!

মিঃ রিচার্ড দীর্ঘকাল এখানে থেকে বুঝেছিলেন, কোন্ দিকে যেতে আছে আর কোন্ দিকে যেতে নেই। কিন্তু ডাক্তার মরিসন তো আর তা জানেন না! তাই রুয়েঞ্জারীর পাশ কাটিয়ে তিনি চলে গেলেন পর্বতের পিছন দিকে! মাঝে মাঝে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করছেন। উদ্দেশ্য, তাঁরা যে এখানে এসেছেন, মিত্রপক্ষ সে সংবাদ জানুক, আর শত্রুপক্ষ সতর্ক হোক্।

অকস্মাৎ কিছুদূরে বেজে উঠলো কাড়া-নাকাড়া। মুহূর্তে ডাক্তারের সঙ্গী, তাঁর কাফ্রী ভৃত্য জুলুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো। সে ডাক্তারকে বল্লো যে নিশ্চয়ই তারা তার স্বজাতীয়দের কোন গ্রামের কাছে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তার পর-মুহূর্তেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল—সে চিৎকার করে ডাক্তারকে বল্লে যে, ওরা যুদ্ধের বাজনা বাজাচ্ছে। সম্ভবতঃ বন্দুকের আওয়াজ শুনেই তারা শত্রু নিপাতের জন্য তৈরী হয়ে আসছে। এখন এদের সামলানো মুশকিল।

জুলুকে ডাক্তার বল্লেন—"তুমি ওদের সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে বলো যে আমরা শত্রু নই, ওদের কোন অপকার করতে আসিনি।"

কিন্তু জুলু তার স্বজাতীয়দের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। তাই সে নিরুৎসাহের সঙ্গে বল্লো, "ওদের উত্তেজনা একটু প্রশমিত না হলে কোন কথাই ওরা শুনবে না। যদি খানিকক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখা চলে, তবে ঐ বাদ্যি-বাজনা আর পাঁয়তারা করার মধ্য দিয়েই ওদের

উত্তেজনার কিছুটা নিবৃত্তি হতে পারে, তখন ওদের সঙ্গে কথা বলা চলতে পারে—কিন্তু এখন তোপের মুখে যে যাবে সেই মরবে।"

ডাক্তার মরিসন মুহূর্তে উপায় স্থির করে ফেল্লেন। তাঁরা সকলে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে লাগলেন। যে গতিতে জংলীগুলো বাদ্যি বাজিয়ে তাল ঠুকে এগুচ্ছে, তার চেয়ে দ্রুতগতিতে ডাক্তার মরিসন পিছিয়ে আসছেন আর মাঝে মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করছেন।

শিবিরে যারা ছিল, তারা বন্দুকের আওয়াজ শুনে অনুমান করলো—ডাক্তার নিশ্চয়ই বিপদের মুখে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একশত বন্দুকধারী চল্লো মার্চ করে। তারা যখন ডাক্তারের দেখা পেলো, তখন ডাক্তার আর পিছুতে রাজী হলেন না। কারণ, শিবিরে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন বটে, কিন্তু শত্রুকে তিনি শিবিরের সন্ধান দিতে রাজী নন। তাই ঐখানেই সৈন্যদলকে তিনি সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জুলুকে পাঠালেন ওদের সঙ্গে কথা বলতে।

জংলীদলও তখন হুড়মুড় করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে মাঠে পড়েছে। সংখ্যায় ওরা হাজারের বেশী। বিচিত্র বেশ-ভূষা—অর্ধ-উলঙ্গ, সর্বদেহে উলকি ; দেহের যে কোন স্থানে পাখীর পালক গোঁজা, হাড়-গোড় আর মানুষের মাথা দিয়ে মালা তৈরি করে তারা গলায় পরেছে। সবার হাতেই তীর-ধনু।

শ্বেতকায় সৈন্যদলের সামনা-সামনি হওয়া মাত্র ওরা "রণং দেহি" ভাব নিয়ে দাঁড়ালো। দু'দলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাফ্রীসন্তান জুলু। মুহূর্তমধ্যে সে সভ্য পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে নিলো। পরনে তার খাটো জাঙিয়া—নিকষ-কালো দেহ নিয়ে সে এগিয়ে চল্লো জংলীদের দিকে।

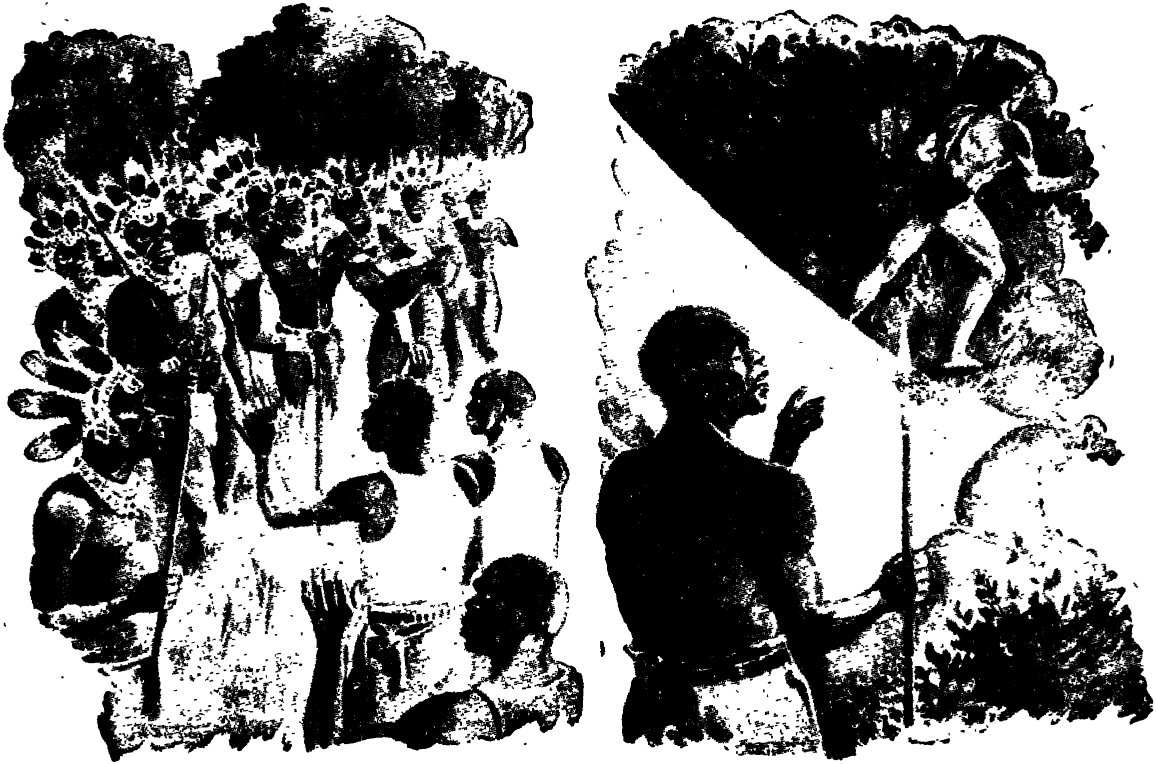
শত্রুদলের মধ্যে অকস্মাৎ একটি স্বজাতীয় প্রাণী দেখে জংলীদল হতভম্ব হয়ে গেল—তাদের উদ্যত হাতিয়ার হাতেই রয়ে গেল। জুলু এগিয়ে গেল—তাদের ভাষায় কী বুঝিয়ে বল্লো। সঙ্গে সঙ্গে দন্তপাটি বিকশিত করে জংলীদের দলপতি এলো। এগিয়ে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করে। ডাক্তার মরিসন ভাবলেন—একে যদি বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়, তবে অনেক বিপদেই এদের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে প্রচুর সহায়তা। তাই তিনি বন্ধুভাবে সদারকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং শিবিরে নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়ালেন প্রচুর আর উপঢৌকনও দিলেন অনেক কিছু।

এখানে পৌঁছানো মাত্রই পরিত্যক্ত ভস্মস্তূপ দেখে তাঁর মন যে ভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল, আকস্মিকভাবে সর্দারের বন্ধুত্ব লাভ করে তিনি তদনুরূপ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

বাঘে মানুষে লড়াই

নোরার এক হাতে পিস্তল, আর এক হাতে সানির হাত। ঘুরঘুটে অন্ধকার—নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। এরি মধ্যে আন্দাজে ওরা পথ চল্‌ছে। মাঝে মাঝে সানি উঁচু গাছের ডগায় উঠে আগুনের দিকে তাকায় আর পথ চলে। আগুন ক্রমশঃ নিভে আসছে দেখে সানি চিন্তিত হলো। কারণ, এই নিশানা ধরে তারা যদি অরণ্য থেকে বেরিয়ে আস্‌তে না পারে, তবে আর তাদের উদ্ধারের কোনো আশাই নেই। অথচ তাদের চল্‌তে হচ্ছে গুটি গুটি—পথ আর শেষ হয় না।

তারপর একসময় আগুন একেবারেই নিভে গেল। কোথায় ছিল শিবির, আর কোথায় অরণ্যের শেষ—কে তাদের বলে দেবে?



সানি আর নোরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু উপায় নেই—পথ তাদের চল্‌তে হবেই, তাই তারা আবার চল্‌ছে কিন্তু তাদের এ যাত্রা কোথায় শেষ হবে কে জানে!

অনেক কিছু আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে তারা যখন এগুচ্ছে—অকস্মাৎ শব্দ শোনা গেল—গর্‌র্ গর্‌র্! এ শব্দ নোরার একান্ত পরিচিত—তার আস্তানার কাছে চিতার ক্রুদ্ধ গর্জন সে প্রায়ই শুনতে পায়; তাই ভয়ে তার হাত-পা যেন পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেল। সানি এক ঝট্‌কায় নোরার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে. আড়াল ক'রে দাঁড়ালো।

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই চিতা লাফিয়ে পড়লো সানির উপর। অন্ধকারে নোরা চিতাকে দেখতে না পেলেও সানি দেখতে পেয়েছিল ওর চোখ—যেন আগুনের ভাটার মতো জ্বল্‌ছে। তাই সে সতর্ক হবার সুযোগ পেয়েছিল। চিতা যে মুহূর্তে লাফ দিয়েছিল, সানি সেই মুহূর্তে সরে গিয়ে, আত্মরক্ষা করতে পারতো বটে, কিন্তু তাতে নোরাকে পড়তে হতো বাঘের মুখে। তাই, সানি প্রাণের মায়া না করে রুখে দাঁড়িয়ে চিতাকে তার উপরই আক্রমণের সুযোগ দিল। কিন্তু সে-ও বড়ো কেউ-কেটা নয়। কাফ্রীসন্তানের দেহটি যেমন বিরাট, শক্তিও তার তদনুরূপ। তাই, চিতা তার উপর লাফিয়ে পড়তেই সেও তাকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

তারপর চল্লো বাঘে-মানুষে প্রাণপণ লড়াই! একবার বাঘ ওঠে উপরে, একবার সানি চড়ে বসে তার বুকের উপর। এরই ফাঁকে ফাঁকে সানি নোরাকে বল্‌তে লাগলো গুলি করতে। কিন্তু নোরাও গুলি করতে পারছে না। একে তো অন্ধকারে সানি আর

বাঘকে পৃথক্ করে দেখা যায় না—তার উপর আবার ভয়ে তার হাত কাঁপছে। বাঘকে গুলি করতে গিয়ে যদি সে সানিকেই গুলি করে বসে! তাই সে গুলি না করে পিস্তল হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এদিকে সানি প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিচ্ছিল—কিন্তু আর বুঝি পারে না, তার দম ফুরিয়ে এসেছে। অকস্মাৎ, কী এক বুদ্ধি ঠাওরে সে গেঁজ থেকে একটা পাথরের ছুরি বার করে নিয়ে বাঘের মুখে দিল গুঁজে। একটা মানুষের বাচ্ছা তার মুখে হাত পুরে দিয়েছে দেখে চিতা যেমনি তা কামড়ে ধরতে গেল, অমনি ছুরি তার ব্রহ্মতালু ভেদ করে বেরুলো। নিদারুণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে বাঘ প্রচণ্ড এক থাবা বসালো সানির দেহে। সানি সংজ্ঞাহারা হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলো।

চিতার জীবনও শেষ হয়ে এসেছিল—অচিরাৎ সেও মৃত্যুবরণ করলো। এত সব ব্যাপার নোরা দেখতে পায়নি; কিন্তু যখন দেখলো, কোন পক্ষেই আর সাড়া নেই, এবার তার ভয় হলো। সে চিৎকার করে ডাকলো—'সানি!'

কিন্তু সংজ্ঞাহারা সানির কানে সে ডাক পৌঁছুল না। কাজেই নোরা কোন জবাব পেলো না। বাঘও চুপ করে আছে দেখে নোরার মনে হলো, হয়তো মরে গেছে, নয় সরে গেছে। তাই সে সাহসে ভর করে হাতড়ে খুঁজে বার করলো সানিকে। গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো—সানি মরেনি, আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। অগত্যা প্রভাতের আশায় নোরা বসে রইলো পিস্তল হাতে—প্রভাতী তারাটির মতোই একলাটি।

খুনের নেশা

ক্ষুব্ধ বঞ্চিত টারজান শিবিরাঞ্চল থেকে ফিরে আসে অরণ্যে, গজরাজ তার সর্বদেহে শুঁড় বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

কোথায় যাবে সে? গারলা মহলে তো কান্নার কলরোল পড়ে গেছে, শিবির অভিযানে কয়েকজন আহত হয়ে এসেছে আর কয়েকজন নিহত হয়ে সেখানেই পড়ে রয়েছে। তাদের আত্মীয়-পরিজনকে আশ্বস্ত করা দরকার—কিন্তু কী আশ্বাস দেবে? ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে—নোরার কথা। অভিমানভরে টারজান নোরার কাছ থেকে চলে এসেছে—সে বেচারী বোধ হয় একলা পড়ে ভাবছে—অন্ধকার রাত্তিরে হয়তো ভয়ে তার ঘুম আসছে না।

হঠাৎ মনে পড়ে—সেই কালো মানুষটার কথা। কী নাম যেন—'সানি', হ্যাঁ—'স্যান'ই বটে। সেই তো আছে নোরার প্রহরায়—তবে আর ভয় কি? কিন্তু টারজানের মনে জাগে ঈর্ষা—প্রতিযোগীর প্রতি ঈর্ষা। না—অরণ্যে ঘুরে ফিরে আর চলবে না। তাকে তার আস্তানায়ই ফিরে যেতে হবে। গিয়ে তার প্রথম কাজ হবে—ঐ কালো মানুষটার ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেওয়া। না, শুধু তাড়িয়ে দিলেই চলবে না—আবার সে জুটতে পারে এসে। ওটাকে একেবারেই শেষ করে ফেলবে। সব আপদ, সব জ্বালা চিরকালের মতোই জুড়িয়ে যাবে।

উৎসাহের আতিশয্যে টারজান সোজা খাড়া হয়ে বসে হাতীর পিঠে, আর তাকে নির্দেশ দেয় আস্তানার দিকে যেতে।

অন্ধকারেই চলে গজরাজ—পথ তার পরিচিত, শুধু শুঁড় সে সামনের দিকে বাড়িয়ে চলে—সাবধানের মার নাই। ক্লান্ত টারজান

তার পিঠে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে হাতী এসে পৌঁছালো টারজানের আস্তানায়—মৃদু গর্জনে টারজানের ঘুম ভাঙ্গিয়ে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে নাবিয়ে দিলো গুহামুখে। গুহায় ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে টারজান। নোরা এসে তাকে ডেকে নিয়ে যাবে—সে নিজে থেকে যাবে না। তাই গুহামুখে দাঁড়িয়ে সে হাতীবন্ধুর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলতে থাকে—তার গলার আওয়াজ শুনেই নোরার ঘুম ভাঙ্গবে, সে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরবে টারজানকে।

কিন্তু অনেকক্ষণ তো হয়ে গেছে—নোরার ঘুম কি এত চিৎকারেও ভাঙলো না? ক্লান্ত অসহিষ্ণু টারজান আর অপেক্ষা করতে পারে না। হাতীবন্ধুকে বিদায় দিয়ে সে আস্তে-আস্তে ঢুকলো গুহায়। নাঃ, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। নোরা যে কি করে পাথর ঠুকে আগুন বার করে—টারজান যদি তা শিখতে পারতো, তাহলে তো এখন অনায়াসেই সে দেখতে পারতো নোরার মুখখানি। অগত্যা হাত্ড়ে হাত্ড়েই টারজান খুঁজতে লাগলো নোরাকে। কিন্তু কোথায় নোরা আর কোথায়ই বা সেই কালো মানুষটা? এই তো সেই উঁচু বেদী—নোরা যেখানে শোয়—কিন্তু নোরা কোথায়? এখানে নেই তো!

টারজান চঞ্চল হয়ে উঠলো। সমস্তটা গর্ত হাত্ড়ে বেড়ালো। কিন্তু না নোরা, না সানি—কারো কোনও পাত্তা নেই। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ টারজান চিৎকার করে বেরিয়ে এলো গর্ত থেকে। অকস্মাৎ তার গগনভেদী চিৎকার শুনে পথের মধ্য থেকেই ফিরে এলো তার হাতীবন্ধু।

টারজান যেন পাগল হয়ে গেছে। দু'হাতে কখন সে মাথার চুল ছিঁড়ছে, কখন সে বুক চাপড়াচ্ছে, আর বুকফাটা চিৎকারে অরণ্যকে মুখর করে তুলছে। অরণ্যের জীবজন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। বন্ধুর দুঃখে হাতীও অন্তরভেদী চিৎকারে দিক্-বিদিক্ প্রকম্পিত করে তুললো। এদের মিলিত চীৎকারে নৈশ স্তব্ধতা যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

একটা জাগুয়ার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল, গুহা-মুখের বিরাট পিপুল গাছটার ডালে। টারজানের চিৎকারে সে প্রমাদ গুনলো। ভাবলো —প্রাণটা নিয়ে তো বাঁচি। গুটি গুটি যেই নেমে এসেছে গাছ থেকে—অমনি তা চোখে পড়েছে টারজানের। টারজানের আজ আর দয়া নেই, মায়া নেই। দৌড়ে এসে সে ঝাপ্‌টে ধরলো জাগুয়ারটাকে। চল্লো প্রাণপণ লড়াই।

কিন্তু দানবের শক্তি এসে গেছে টারজানের দেহে—জাগুয়ার নন্দন তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলো না। টারজান দুহাতে তার একটা পা ধরে সবেগে ঘুরাতে লাগলো—তারপর পাথরে আছাড় দিয়ে তাকে হত্যা করলো। কিন্তু মনের ক্ষোভ তার এতেও মিটলো না— হাতীবন্ধুর সাহায্যে ওর দেহটাকে সে দলে পিষে একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল।

এদিকে ভোর হয়ে এসেছে—পাখীর দল কলকাকলীতে প্রভাতকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কিন্তু টারজানের নিকট আজ পাখীর গানও অসহ্য। তাকে খুনের নেশায় পেয়ে বসেছে—সে গাছে উঠে পাখীর বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে গলা ছিঁড়তে লাগলো। পাখীর দল উড়ে উড়ে পালাতে লাগলো।

গাছ থেকে নেবে টারজান আব মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলো না—উত্তেজনার প্রচণ্ডতায় সে গুহামুখেই হতচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়লো। হাতীবন্ধু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো জলের সন্ধানে।

মৃত্যুর মুখোমুখি

ভোর হয়ে এলো—সারারাত নোরা চোখের পাতা জুড়তে পারেনি। ভয়ে উৎকণ্ঠায় সে সারারাত বসে আছে সানির পাশে। আর শেষদিকে যখন টারজানের ক্রুদ্ধ গর্জন অরণ্য ভেদ করে পৌঁছুলো তার কানে, তখন মমতায় নারীর প্রাণ কেঁদে উঠলো। সে বুঝতে পারছে—টারজান নিশ্চয়ই গুহায় ফিরে এসেছে এবং তাকে দেখতে পায়নি বলেই এই ক্রোধ। কিন্তু নিরুপায় নোরা। এখনতো সে স্রেফ অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে! শিবিরে পৌঁছুবার লোভে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসে অকূল সাগরে পড়েছে। কী করবে, না করবে, ভেবে উঠতে পারছে না।

ভোর হয়ে এলো, রাতের অন্ধকার কেটে গেছে। নোরা এতক্ষণে দেখতে পাচ্ছে সানি আর চিতা উভয়কে। সানির সর্বদেহে ক্ষতের চিহ্ন—ক্ষতমুখে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। আর তার পাশেই চিতা পড়ে আছে মৃত অবস্থায় 'হাঁ' করে—পাথরের ছোরাটা তার ব্রহ্মতালু ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে।

এই নির্জন অরণ্যে সানিই এখন নোরার একমাত্র সহায়। অথচ সে-ই পড়ে আছে মৃতের মতো সংজ্ঞাহীন হয়ে। তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। নোরা চল্লো ঔষধের সন্ধানে।

অরণ্য-জীবনে সে অন্ততঃ কতকগুলো গাছগাছড়া চিনেছে, যার সাহায্যে যে কোন প্রকার ক্ষত আরোগ্য করা চলে এবং নির্জীবকে সুস্থ-সবল করে তোলা চলে। দিনের আলোয় নোরার ভয়ও কিছুটা কমে গেলো—তবু সে হাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরলো। যেতে যেতে নোরাকে অনেকটা যেতে হলো।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে সানির চেতনা ফিরে এসেছে—কিন্তু দেহ অতিশয় ক্লান্ত, অবসন্ন। তবু চোখ মেলে তাকিয়েই সে খুঁজলো নোরাকে। কিন্তু কী সর্বনাশ! নোরা তো নেই! ক্ষীণ কণ্ঠেই সে চিৎকার করে ডাকলো— নোরা!'

কোন উত্তর নেই। মাথা তার ঘুরছে কিন্তু তবু সে মাথা তুলে বসলো। যতখানি দৃষ্টি যায়—কোথাও নোরার কোন চিহ্ন নেই। হায়, হায় শেষ পর্যন্ত সেই হলো কি নোরার মৃত্যুর কারণ? যদি সে নোরাকে গুহা থেকে বের করে না আনতো—তবে হয়তো এ দুরবস্থা তার হতো না! দুঃখে নৈরাশ্যে সানি একেবার ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু বিপদের কি আর শেষ আছে?

এদিকে মরা বাঘের মাংসের লোভে বিরাট-দেহ এক পার্বত্য শকুনি এসে বসেছে বাঘের উপর—কিন্তু কাছেই অর্ধ-জীবিত একটা প্রাণীকে দেখে সে বোধ হয় ভেবেছে—এ আবার কী উৎপাত! তাই শকুনিপ্রবর সানিকেই সাবাড় করতে চেষ্টা করলো।

সানির তখন প্রাণান্তকর অবস্থা! সুস্থ অবস্থাতেই এই বিরাট শকুনিকে ঘায়েল করা মুস্কিল—তাতে আবার সে অত্যন্ত অসুস্থ। শকুনি ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে আসছে—আর কখনো পাখার ঝাপটা মারছে, কখনো বা ঠোঁটের আঘাতে তার দফারফা করছে।

উন্মত্ত হয়েছে। সানি তার গেঁজে থেকে একটা ছোরা বার করে যথাসম্ভব আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলো—কিন্তু আর বুঝি পারে না।

ঔষধ নিয়ে ফিরে আসছে নোরা—দূর থেকেই সে দেখতে পেলো দৈত্যের মতো বিরাট শকুনির আক্রমণে সানি কাবু হয়ে পড়েছে। নোরা বুঝতে পারলো—সানির এবার নিশ্চিত মৃত্যু। তার মনে সাহস এলো—দিনের আলোয় এবার সে বেপরোয়া হয়েই শকুনিকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো। একটি গুলির আঘাতেই শকুনি ধরাশায়ী হলো। নোরা দৌড়ে এসে সানির উপর থেকে শকুনিটাকে টেনে সরালো। কিন্তু তাই কি সে পারে? তারপর তার আনীত গাছগাছড়ার পাতা হাতে রগড়ে খানিকটা রস করে কিছুটা সানিকে খাওয়ালো, কিছুটা তার চোখে দিল—আর বাকীটা ক্ষতস্থানগুলোর মুখে লাগিয়ে দিল।

অল্পক্ষণেই সানি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। জটিলতার সমস্যা তাদের সামনে···এখন তারা কি করবে? অরণ্যের পথ খুঁজে বার করবে—সে ভরসাও নেই, আবার হিংস্র শ্বাপদসংকুল অরণ্যে বাস করবে—সে উপায়ও নেই। তবে কি এবার তারা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেই এগিয়ে যাবে?



গাছের একটা ডালের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিল এক টান

সপ্তম পর্ব

শিবির-সন্ধানে

নোরার ডাক্তারিতে সানি কিছুটা সুস্থ হল বটে, কিন্তু দাঁড়াতে বুঝি আর সে পারে না। মাথা তার ঘুরছে, পা দুটো টলছে—ভীষণ বেদনা অনুভব করছে সর্বশরীরে। হাত দুটো বাড়িয়ে দিল নোরার দিকে। মুখে কথা নেই তবু নোরা বুঝে নিল সে কি চাইছে। নোরাকেই ধরতে চায় সে একটা অবলম্বন। যার জোরে কিছুটা পথ ঘুরে সে তাদের নতুন শিবিরের সন্ধান করতে পারে।

নোরা বুঝল সানির অবস্থা। তার মনের অবস্থাও বড় ভাল নয়। টারজানের আশ্রয় সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে। পিতার কাছ ছাড়া হতে পারে না সে। সেই আকর্ষণেই এই বিপদের মাঝে ঝাঁপ দিয়েছে। গহন অরণ্য। যে কোন মুহূর্তেই যে কোন বন্য জন্তু আক্রমণ করতে পারে। এছাড়া আরো কতশত বিপদের সম্ভাবনা। অক্ষত দেহে পিতার কাছে যে ফিরে যেতে পারবে সে সম্ভাবনাই বা কোথায়? একবার মনে পড়ল টারজানের কথা। একবার চেঁচিয়ে ডাকবে কি তাকে? না না। চায় না সে টারজানকে। সে ফিরে যেতে চায় তার বাপের কাছে। টারজান হয়ত তাকে বন্যজন্তুদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু পিতার স্নেহ-নীড় থেকে চিরদিনের জন্য তাকে নির্বাসিত হতে হবে।

"একটু জল।" নোরার কাঁধের ওপর হাত রেখে হাঁটু ভেঙে সানি বলল।

কিন্তু কোথায় জল? চারিপাশ ঘুরে দেখে এসেছে নোরা। কোথাও জল নেই। একটা পার্বত্য ঝরনার সন্ধান সে জানে। কিন্তু সে তো টারজানের এলাকার মধ্যে। তারই গুহার কাছাকাছি। সেখানে সে যেতে পারে না। আবার টারজানের হাতে পড়বে। টারজানকে তার ভাল লাগে। গ্রীক ভাস্করের নিপুণ হাতে তৈরী তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। চোখে মুখে বীরোচিত দীপ্তি, শরীরে তার আসুরিক শক্তি। কিন্তু তা হলেও পিতার স্নেহাঞ্চল যে আরো বেশী কাম্য!

"এখানে তো কোথাও জল নেই সানি,—তুমি বেশ করে আমার কাঁধে ভর দাও, এগিয়ে গিয়ে দেখি। যদি আমাদের শিবির পেয়ে যাই তো ভালো, নিদেন একটু জলের সন্ধান।"

"না নোরা, এখনও আমার দেহে রক্ত আছে। আমি অসুস্থ বটে, কিন্তু, এই বিপদের মাঝে তোমার ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকতে পারব না বেলা অনেক হয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যেই শিবিরের সন্ধান করতে হবে, নইলে আবার বাঘ-ভাল্লুকের হাতে পড়তে হবে।"

নোরা কিন্তু তবুও তার একটা হাত ধরে রইল, অন্য হাতে উঁচিয়ে রাখল তার পিস্তলটা। তারপর ধীর পায়ে দুজনে এগিয়ে চলল শিবিরের সন্ধানে।

নোরার সন্ধানে টারজান

নিরাশার অবসাদে টারজানের স্নায়ুগুলো বোধ হয় ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে।

ঘুম ভেঙেই দেখল, তারই গুহার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে

সে শুয়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল সে। পরক্ষণেই মনে পড়ল নোরা নেই। অতীতের ঘটনাগুলো একটার পর একটা স্মৃতিপথে জেগে উঠল। বুকটা তার হা-হা করে উঠল। ক্রোধে ক্ষোভে নিজেরই মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। নিশ্চয়ই সেই কালো বাঁদরমুখো মানুষটা নোরাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। একবার যদি সে হাতের কাছে তাকে পায়, তার মুণ্ডটা ছিঁড়ে আকণ্ঠ তার রক্ত পান করে গায়ের ঝাল মেটায়।

না—এবার উঠতে হবে। প্রথম কাজ—নোরাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর সেই কালোমুখো মানুষটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা দিতে হবে-যে আর যেন সে তাকে বিরক্ত করতে না আসে। বন্য প্রতিহিংসায় তার সারা দেহটা একবার দুলে উঠল। সে একটা হুংকার ছাড়ল। বন থেকে বনান্তরে তার রেশ বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে চললো। সারা বনভূমিটা একবার কেঁপে উঠলো।

এইবার টারজান তার পরের কর্তব্য স্থির করে নিল। নিশ্চয়ই নোরাকে নিয়ে ওরা ঐ শিবিরে ফিরে গেছে। সেখানেই যাবে সে; শিবির তছনছ করে নোরাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। এবারে সে আগুনকেও গ্রাহ্য করবে না।

গাছের ঝুরি ধরে ধরে সে এগিয়ে চললো প্রাণপণ দৌড়ে মানুষ বা জানোয়ার যে পথ অতিক্রম করতে পারে না, শুধু দোল খেতে খেতে সে একটার পর একটা ঝুরি ধরে তার চেয়ে কম সময়ে বেশী পথ চলে গেল। এক জায়গায় দেখল একটা মরা চিতাবাঘ। তার উপর বসে একটা বিরাট শকুনি মহা আনন্দে ভোজ লাগিয়েছে।

একটুখানি থেকে চিতাবাঘটাকে বেশ করে দেখল সে। কি করে মারা পড়ল বাঘটা? নিশ্চয় কেউ একে মেরে রেখে গেছে।

বাঘটার সারা গা খুঁজেও কোন অস্ত্রের আঘাত তার চোখে পড়লো না। শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়েছে খানিকটা রক্ত। দুহাতে তার চোয়াল দুটো উঁচ করতেই দেখল, মুখের ভেতরে একখানা ধারাল পাথরের ছোরা। আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে সেটা। ছোরাখানা টেনে বের করে নিল টারজান। ভাবল এই অস্ত্রটা নিশ্চয়ই সেই কালোমুখো মানুষটার। তা হলে ওরা এই পথেই গিয়েছে।

আবার একটা গাছের ঝুরি ধরে যেই সে নিজের দেহটাকে দুলিয়ে দিতে যাবে এমন সময়ে দূর থেকে শুনতে পেল একটা পরিচিত গলার স্বর। গাছের ঝুরিটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে ভাল করে ঠাহর করে দেখল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে তার হাতীবন্ধু। তাহলে তার হুংকার সে শুনতে পেয়েছিল! সেই শব্দ শুনেই তার হাতীবন্ধু শুঁড় উপরে তুলে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

টারজান একটা আনন্দসূচক হুংকার ছেড়ে তার হাতীবন্ধুকে আহ্বান জানালো। নিমেষের মধ্যেই হাতীটা সেই গাছের নীচে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। টারজান গাছের ঝুরি ছেড়ে তার পিঠের ওপর চড়ে বসলো। তারপর কত কথাই বললো সে হাতীকে। হাতী তার ভাষা বুঝল না বটে, কিন্তু চুপ করে শুনে গেল টারজানের অন্তরের কথা। বুঝলো নোরা নেই—তাই তার বন্ধু আজ এত বিচলিত। বন্ধুর এই বিপদে কি বলে সে সহানুভূতি জানাবে? দু ফোঁটা চোখের জল তার ছোট্ট ছোট্ট চোখ বেয়ে গড়িয়ে এলো।

হাতীবন্ধুর পিঠে সওয়ারী হয়ে টারজান চললো সেই শিবিরের

দিকে। শীঘ্রই তারা পৌঁছে গেল তাদের লক্ষ্যস্থলে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথায় গেল তাঁবু আর তার লোকজন! তারা তো তাকে এই স্থানেই বন্দী করে রেখেছিল। জায়গাটা তার মোটেই অপরিচিত নয়। কিন্তু আজ শুধুই গভীর অরণ্যের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সেখানে। একটা গাছের মাথায় আশ্রয় বেছে নিয়ে টারজান তার হাতীবন্ধুকে বিদায় দিল আর হাব-ভাবে জানিয়ে দিল ডাকলেই যেন সে আবার এসে হাজির হয়।

ভুত!

ডাক্তার মরিসন, মিঃ রিচার্ডের পরিত্যক্ত স্থানেই তাঁবু ফেলতে প্রথমে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরে সে ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করলেন। ঘরপোড়া স্থানটা তাঁর যেন পছন্দ হল না। তিনি রুয়েঞ্জারী পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে পাহাড়ের পিছনের দিকে শিবির স্থাপনা করলেন।

তাঁর হাতে অনেক কাজ। নর-বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, বনমানুষের এই গোষ্ঠী নিয়েই তিনি আজীবন গবেষণা করে এসেছেন। সেই গবেষণা-কার্যের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছেন তিনি। টারজানকে তাঁর চাই। তাকে পেলে তাঁর কয়েকটা সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হবে।

সন্ধ্যা হয় হয়। ডাক্তার মরিসন আরাম-কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে চা পান করছেন। চিন্তার তাঁর শেষ নেই। মিঃ রিচার্ডই বা কোথায় গেলেন? উইলসন-দম্পতিও এই অরণ্যে অভিযান শুরু করেছেন, তাঁদেরই বা পাত্তা কোথায়? আর টারজান?—যাকে তাঁর সবচেয়ে বেশী দরকার।

এসব নানা কথা ভাবছেন, এমন সময় একটা চিৎকারে চমকে উঠলেন ডাক্তার মরিসন। একটা বিকট কণ্ঠস্বর। না মানুষের না জানোয়ারের—অশ্রুতপূর্ব একটা কণ্ঠধ্বনি।

"কে হাঁক দিল ওভাবে?" ডাক্তার তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলেন।

"কত রকমের অদ্ভুত জানোয়ার আছে। অনেক জানোয়ার আছে যাদের নাম পর্যন্ত কখন শুনিনি—পাহারাদারেরা প্রস্তুত আছে হুজুর।"

ডাক্তার মরিসনের বুকটা ছাঁত করে উঠল। একটা নতুন কিছু হয়তো দেখতে পাবেন এই আশাই তিনি করলেন। মুখে কিন্তু কাউকে কিছু বল্লেন না।

সেই রাত্রেই শিবিরে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। একজন পাহারাদার হঠাৎ মাঝরাতে ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়লো। শিবিরের লোকজন সকলেই জেগে উঠে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লো। বড় বড় মশাল জ্বেলে দেওয়া হলো। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই পাহারাদারের মূর্ছা ভেঙ্গে গেল। তখনও তার ভয় কাটেনি। এদিক ওদিক চেয়ে একটা কথা শুধু সে বলল, "ভূত।"

ডাক্তার মরিসন ওষুধ দিয়ে তাকে চাঙ্গা করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে তাকে প্রশ্ন করলেন। ডাক্তার নিজে ভূত বিশ্বাস করেন; কিন্তু এই ভূতটা কি রকম দেখতে—আর কিসে সে বুঝল যে অন্য জানোয়ার নয়, এটা একটা ভূত? বেশ করে ভেবে চিন্তে সে যা দেখেছে, তাই যেন বলে।

লোকটা চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, "জানোয়ার কেন হবে? দীর্ঘাকার মানুষ একটা। সাদা চামড়ার মানুষ, প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ। প্রথমে দেখলুম একটা গাছের চারদিকে জোছনা ফুটফুট করছে, আমার চোখের দৃষ্টির একটুও ভুল হয়নি। পর-মুহূর্তেই চলে গেল আর এক গাছে—তারপর আমাদের তাঁবুর দিকে মারল এক লাফ। আমি বল্লম সোজা করে ধরলুম। কিন্তু কোথায় কে? নিমেষের মধ্যে তীরের মত ছুটে কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনও আমি ভয় পাইনি। কিছুক্ষণ পরে একটু তন্দ্রা মত এলো। একবার মাত্র চোখ বুঁজেছিলুম। চোখ খুলেই দেখি, সামনের গাছে ঝুলছে আর দোল খাচ্ছে সেই মূর্তি। আমার ঘাড়ের উপর বুঝি এসে পড়ে। বল্লম আর তুলতে পারলুম না। হাত দুটো অবশ হয়ে গেল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তারপর আর কিছু জানি না।"

ডাক্তার বললেন, "তুমি ঠিক দেখেছ—মানুষের মত?"

কাঁপতে কাঁপতে পাহারাদার বললো, "বিশ্বাস করুন হুজুর, ওটা সাহেব ভূত—এতদিন জঙ্গলে রইলুম, কত বাঘ-সিংহ দেখলুম, ভয় পেলুম না—আর একটা নতুন জানোয়ার দেখে ভয় পাবো? নিশ্চয়ই কোন সাদা চামড়ার সাহেব এখানে মরে ভূত হয়ে আছে। এখান থেকে শিবির তুলে নেন হুজুর।"

তখন জংলী অনুচরেরা সকলেই একটা একটা ভূতের গল্প বলতে আরম্ভ করল। মাঝরাতে শিবিরের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠলো।

ডাঃ মরিসন কিন্তু ওদের কথায় কান দিলেন না। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস হল টারজানকেই দেখেছে সেই পাহারাদার। তিনি ঠিক

করলেন এখান থেকে শিবির তোলা হবে না। এর আশেপাশেই কোথাও টারজানের আস্তানা আছে নিশ্চয়।

বিপদের কালো ছায়া

নাইরোবিতে এসে মিঃ রিচার্ড এবং উইলসন দম্পতি সুস্থির হতে পারলেন না। নিজেদের সন্তানের উদ্ধারের চিন্তায় তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

আবার 'সাজ সাজ' রব পড়ল। নতুন করে জিনিসপত্র যোগাড় হল। তাঁবু, আহার্য, অস্ত্র-শস্ত্র সব কিছুরই দরকার। ইতিমধ্যে ডাঃ মার্সনের অভিযানের সংবাদও তাঁরা পেলেন। এতে তারা উৎসাহিতই হলেন। মিঃ রিচার্ড ভাবলেন, ভালই হল তাঁর সঙ্গে যখন যথেষ্ট লোকজন আর জিনিসপত্র রয়েছে তখন সেখানে গিয়ে একবার জুটতে পারলেই হল। তাঁর জঙ্গলের অভিজ্ঞতা আর ডাক্তারের জিনিসপত্র মাল-মশলা। বুকের জোর তাঁর বেড়ে গেল শতগুণ। তাঁরা হৈ হৈ করে আবার কয়েঞ্জারী অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দিলেন।

অগুনতি পাহাড়-পর্বত আর নিবিড় অরণ্যে ঢাকা আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল প্রায় জনবসতিশূন্য। পাহাড় আর অরণ্যের কোলে বাসা বেঁধে আছে হিংস্র শ্বাপদ, বিষধর সাপ আর কত নাম না-জানা জীবজন্তু। মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয় কম - শুধু এদের নয়, ঐ সমগ্র অঞ্চলেই মানুষের পদধূলি পড়েছে কচিৎ। শুধু মাঝে মাঝে দল বেঁধে চলে বুনো মানুষের দল। আর চলে কদাচিৎ কোন অভিযাত্রী দল— জঙ্গল কেটে ওরা পথ করে নেয়। কিন্তু পথের চিহ্ন ওদের চলে যাবার



অতি আড়ষ্টভাবে জংলীটা মিঃ রিচার্ডের করমর্দন করল।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কাজেই পথিক যতবার পথ চলে, ততবার তাদের পথ তৈরী করে নিতে হয়। কিন্তু সে অরণ্যে পথ চলবার কষ্ট শুধু এইটুকুই নয়—পদে পদে দিগ্‌ভ্রম হবার থাকে আশঙ্কা। কারণ, অরণ্যের রূপ প্রায় সর্বত্রই এক রকম।

মিঃ রিচার্ডের দল এমনি অরণ্যের মধ্য দিয়েই পথ করে চলেছিলেন কয়েঞ্জারীর দিকে। এই পথ তাঁদের নতুন নয়—তাঁদের দলের অনেকেই অনেকবার এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন, কখনও সহজে কখনও বা কষ্টে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা লক্ষ্যস্থানে বার বারই পৌঁছেছেন। কিন্তু তবু দুর্ঘটনা ঘটে আকস্মিকভাবেই।

মিঃ রিচার্ড সদলবলে পথ হারালেন। অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় তাঁরা বৃথাই আরো অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। কতবার করেছেন বন্দুকের আওয়াজ—যাতে টা মরিসন সে শব্দ শুনে পাল্টা আওয়াজ করে ওদের পথের সন্ধান দেন! কিন্তু বৃথাই চেষ্টা—মিঃ রিচার্ড যে ভুল পথে কয়েঞ্জারী পর্বতের উল্টোদিকে গিয়ে পৌঁছেছেন, তা বুঝতেই পারেননি, বরং বন্দুকের আওয়াজ করে তাঁরা আরও বিপদ ডেকে আনলেন।

সদলবলে মিঃ রিচার্ড যে অঞ্চলে শিবির স্থাপন করলেন, ঐ অঞ্চলে এর আগে কোন সভ্য মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। তাই স্থানীয় অসভ্য আদিবাসীরা ক্রমাগত বন্দুকের শব্দ শুনে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। প্রথম প্রথম তারা ভেবেছিল, হয়তো এই শব্দ কোন দৈব অথবা ভৌতিক ঘটনাই হবে। কিন্তু শীগ্‌গিরই তারা আবিষ্কার করলো যে একদল সাদা মানুষই এই সমস্ত করে বেড়াচ্ছে।

কাজেই একদিন হাজার হাজার বন্য জাতি একসঙ্গে শিবিরে হানা দিতে চল্লো।

অস্ত্র তাদের পাথরে গড়া—তীরধনু, বল্লম, ছোরা ইত্যাদি। তারা লোহার ব্যবহার জানলেও তার ব্যবহার অত্যন্ত পরিমিত। কাঠের গুঁড়ি ফাঁপা করে চামড়া দিয়ে ঢেকে ঢাক তৈরি করে দমাদম পিটছে—এই সংকেতেই চারিদিক থেকে বন্যরা এসে সমবেত হয়েছিল। সবদিক দিয়ে তারা তৈরী হয়েই হানা দিল মিঃ রিচার্ডের শিবিরে। শিবিরবাসীরা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প—গুনে গেঁথেও পঞ্চাশ জন হয় কিনা সন্দেহ। অপর পক্ষে অসভ্যরা সংখ্যায় অনেক বেশী। অবশ্য শিবিরবাসীদের হাতে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, তার সাহায্যে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা খুব কঠিন ছিল না। তবু বৃদ্ধ মিঃ আয়রন-সাইড বল্লেন: "অনর্থক প্রাণিহত্যা করে লাভ কি? সন্ধির চেষ্টাই করা ভাল।"

ডাঃ উইলসনও এই অভিমতে সমর্থন জানালেন। তিনি আরও বল্লেন: "বরং যদি এদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করতে পারি, তা হলে অরণ্যে ঘোরাঘুরির পক্ষে ওরা আমাদের সহায়কই হবে।"

কিন্তু মুস্কিল হলো—সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাবে কে?

তাদের দলে কয়েকজন আদিবাসীও ছিল। কিন্তু শত্রু-দল ওদের স্বজাতি কিনা তা তারা নিজেরাও বুঝতে পারছিল না—কাজেই দূতিয়ালী করতে যেতেও তারা সাহস পায়নি।

এদিকে ঢাক পিটিয়ে আর বিকট উল্লাসধ্বনি করে শত্রুদল ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। পরামর্শের সময় এবং সুযোগ আর নেই।

মিঃ রিচার্ডই বুদ্ধি দিলেন, তিনি বল্লেন: "আমাদের মধ্যে যে

কয়জন আদিবাসী আছে, তারা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করুক। এদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও কি আর ওদের কথা বুঝবে না ?”

ধড়াচূড়া ছেড়ে নিখুত আদিবাসীর বেশে সজ্জিত হয়েই জনদশেক কৃষ্ণকায় বাণ্টু যুবক দ্রুতপদে এগিয়ে গেলো শত্রুদল-অভিমুখে। তাদের প্রত্যেকের বামহাত উপরের দিকে তোলা। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে ওদের প্রত্যেকের কোমরেই একটি করে পিস্তল ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

দূর থেকে শিবিরবাসীরা লক্ষ্য করল—তাদের প্রেরিত দূতগণ শত্রুপক্ষের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই শত্রুদল তাদের ঘিরে ফেল্লো।

আশঙ্কিত হলো শিবিরবাসীরা। আবার আশ্বস্ত হলো এই ভেবে যে, ওরা আর এগুচ্ছে না। কাজেই হয়তো বা সন্ধি হয়ে যাবে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কেটে গেলো তারপরই অকস্মাৎ শত্রু দলের মাঝে শোনা গেলো “গুড়ুম্ গুড়ুম্।” পর পর কয়েকবার পিস্তলের আওয়াজ হতেই শিবিরবাসীরা বন্দুক, রাইফেল বাগিয়ে ধরে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়াল।

মিঃ রিচার্ডের আদেশে প্রথমেই কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করা হলো। তারপরই তারা দ্রুতপদে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। শত্রুদলকে তারা শিবিরের কাছেই আসতে দেবে না।

ষষ্ঠ পর্ব

শিবির না দুর্গ

বৃথাই অনুসন্ধান করে বেড়ালেন ডাঃ মরিসন। মিঃ রিচার্ড বা তাঁর দলবলের কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন তিনি নাইরোবিতে। সেখানে তাঁদের সম্বন্ধে কোন কথা কেউ যদি বলতে পারে! ফিরে এলো ডাঃ মরিসনের প্রেরিত লোক—নাইরোবিতে মিঃ রিচার্ড কিংবা তাঁর দলের কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। তাঁরা নাকি আগেই এদিকে রওনা হয়ে এসেছেন।

অবাক হলেন ডঃ মরিসন। সত্যি যদি সদলবলে মিঃ রিচার্ড নাইরোবি থেকে রওনা হয়ে এসে থাকেন, তবে তাঁদের তো আরো আগেই এখানে এসে পৌঁছানো উচিত ছিল। পরিচিত স্থান, পরিচিত পথ; তাঁদের এতো দেরি হবার তো কোনই সংগত কারণ নেই। তবে কি—

ভাবছেন ডাঃ মরিসন: তবে কি মিঃ রিচার্ড পথভ্রান্ত হলেন?

কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না ডাঃ মরিসন। স্থির করলেন, আর অপেক্ষা না করে নিজের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। এতদিন তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনই কাজ করেননি। বিশ্রাম, অরণ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া আর চারদিকে নজর রাখাতেই তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। এখন থেকে সত্যি সত্যি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

টারজান বা নোরার দেখা একদিন তিনি পাবেনই। পছন্দমত একটা জায়গায় তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন। একবার শিবিরের চারদিক ঘুরে এলেন।

তাঁর শিবির বেশ সুদৃঢ়। যাতে সহসা কোন শত্রুই তাঁদের আক্রমণ করতে না পারে, সেই ভেবেই তিনি সেটা তৈরি করেছিলেন। মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি বেশ ঘন ঘন পুঁতে তাঁর শিবিরের চারদিকে বেশ শক্ত করে বেড়া। আর সেই বেড়ার বাইরে চারদিক ঘিরে কাটানো সুগভীর পরিখা। সহজে কোন বন্যজন্তু এখানে ঢুকতে পারবে না; কোন বুনো জাতও সহসা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাঁর শিবিরটা যেন ছোটখাট একটি দুর্গ।

ডাঃ মরিসনের ভয় ছিল গরিলা, হাতী আর হায়েনাকেই। যদি গরিলার দল, হাতীর পাল কিংবা হায়েনার ঝাঁক একবার এসে ঢুকে পড়তে পারে, তবে আর নিস্তার নেই, এই কারণেই তাঁর কাছে এত শক্ত দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বুনো জাতের মানুষ সম্বন্ধে তাঁদের তত ভয় ছিল না। কারণ, স্থানীয় বান্টুদের সর্দার ওয়াম্বার সঙ্গে ডাঃ মরিসনের দস্তুরমতো বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল।

শিবিরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ডাঃ মরিসন এসে বসলেন বৈঠকখানায়। তারপর তাঁর আদেশে এক বিউগিলধারী সৈনিক বিউগিলের একটা বিশেষ ধ্বনিকে তিনবার আবৃত্তি করলো।

ডাঃ মরিসন এবং তাঁর দলবলের সবাই যথেষ্ট সভ্যতার আলোক পেলেও এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশে তো আর সভ্যতার উপকরণ জুটবে না। টেলিগ্রাম নেই, টেলিফোন নেই—বাইরের কারো সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সভ্যতাসম্মত কোন উপায়ই নেই। তাই নিরুপায়

হয়ে তাঁরা স্থানীয় অসভ্যদের রীতি-নীতিটাই ধার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওদের ভাষাটাও অল্পস্বল্প আয়ত্ত করেছিলেন তিনি।

ওয়াম্বার নির্দেশমতই এইভাবে বিউগিল বাজানো হতো, সুদূর গ্রামে অরণ্যের মধ্য দিয়ে লোক পাঠিয়ে তাকে খবর দেওয়ার চাইতে বিউগিল-এর বিশেষ সংকেতে তাকে আহ্বান করাটাই সহজতর উপায় বলেই ডাঃ মরিসন ওয়াম্বার এই নির্দেশ গ্রহণ করেন।

তারপর থেকে যখনই ওয়াম্বাকে ডাকবার প্রয়োজন হতো, তখনই এই বিশেষ সুরে তিনবার বিউগিল বাজানো হতো।

সমসূত্রেই বন্ধুতা চলে। ওয়াম্বাকে ডাক্তার মরিসন বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে ওয়াম্বারও অধিকার ছিল ডাক্তার মরিসনকে আহ্বান জানানোর। অবশ্য জীবনে নানাভাবেই তাদের বিপদে পড়তে হয়—তাই ডাক্তার মরিসনের আহ্বানও পড়তো মাঝে মাঝে।

বিউগিল শুনে ওয়াম্বা সঙ্গে কয়জন যুবক নিয়ে এসে ঢুকলো শিবিরে। তারপর শুরু হলো তাদের পরামর্শ-সভা।

নোরার বিপদ

নোরার দেহে ভর দিয়েই এগিয়ে চলেছে সানি। পরিশ্রান্ত হলে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার এগোয়, এমনি ভাবে চলে চলে পড়ন্ত বেলায় তারা এসে উপস্থিত হলো এক নদীর ধারে। কোথায়, কতদূরে লোকালয়, আর শিবিরই বা কোথায়—কেউ জানে না। এদিকে

সন্ধ্যা আসন্ন—একটা আশ্রয়ের সন্ধান না পেলে মৃত্যু অনিবার্য। ভেবে আকুল হয়ে পড়লো নোরা।

সাহস দেবার মতো কিছুই নেই, তবু সানি তাকে আশ্বাস দেয়। বলে: "মনে হচ্ছে, এই নদীটাই আমাদের শিবিরের কাছ দিয়ে গেছে—কিন্তু তা উজানে না ভাটিতে তা বুঝতে পারছিনে।"

সানি কথা বলতে বলতেই দেখা গেল উজান থেকে স্রোতে ভেসে আসছে একটা ডোঙ্গা—তাতে দু'জন আরোহী। খরস্রোতা পার্বত্য নদী, কাজেই স্রোতের বেগে ডোঙ্গা বেশ দ্রুতই এগিয়ে আসছে।

আনন্দে সানির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে নোরার দিকে তাকিয়ে বলে: "ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন মিস্। তাই এদের দেখা মিলল।"

নোরা কিন্তু এদের পেয়েও খুব নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। অর্ধ-উলঙ্গ দুটো বুনো জাতির লোক যে তাদের সাহায্য করবে, এ বিশ্বাস তার মনে নাই।

সানি দুই হাত তুলে অবোধ্য এক ভাষায় নৌকারোহী দু'জনকে ডেকে কি বল্লো। বুনো দুটি নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলো, তারপর অতিকষ্টে ডিঙ্গি এনে তীরে ভিড়ালো।

সানির সঙ্গে তাদের খানিক কথা চলল। ক্রমশঃ সেটা বেশ জোরে জোরে হতে লাগলো। নোরা তাদের ভাষা কিছু বুঝতে না পারলেও বেশ বুঝলো যে, তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। সানি দুর্বল—খুব চেঁচাতে পারছে না; তবু তার চোখের দিকে তাকাতেই বোঝা যায় যে, সেও বেশ চটে গেছে।

ভয়ে নোরার বুক কাঁপতে লাগলো। কিন্তু অরণ্য-জীবনে সে

বুঝেছে যে ভয় পেয়ে ঘাবড়ালেই বিপদ। তাই সে সাহসে ভর করে দৃঢ় মুঠিতে চেপে ধরে পিস্তলটা।

ওদিকে কিন্তু বুনো দু'টো ক্রমশঃই উগ্র হয়ে উঠছে—তারা যেন সানিকে আক্রমণ করবার মতলব করছে। নোরা চিৎকার করে সতর্ক করে দেয় সানিকে। সহসা যেন সানির দেহে হস্তীর বল ফিরে এলো। সে নোরার হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে তাক করলো ওদের দিকে। তারপর চিৎকার করে কী বল্লো। সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাত উপরে উঠে গেল।

বুনো অসভ্য হলেও পিস্তলের মাহাত্ম্য ওরাও জানতো। শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করলেও ওরা ভয়ও করতো ওদের যথেষ্ট। নোরা ওদের কথা বুঝতে পারেনি। তার মনে হল, সম্ভবত তাকে নিয়েই ওই বুনোদের যত আপত্তি। সে নিজেও ওদের খুব পছন্দ করে না, কিংবা তাদের সঙ্গে ওর যাবারও খুব মত নেই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই আসন্ন বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যেতে রাজী হলো।

ইতিমধ্যে সানি ওদের দু'জনকে যেন হুকুমের সুরে আবার কি বল্লো। তারপর ওরা দু'জন নিজেদের মধ্যে কি আলাপ করে নিয়ে খুব নরম সুরেই যেন সানিকে তাদের সম্মতি জানালো।

সানি নোরাকে বল্লো: চলো মিস্—শেষ পর্যন্ত শয়তান দুটো আমাদের পার করে দিতে রাজী হয়েছে। ওপারে লোকালয় আছে, তারা আমার স্বজাতি। ওখানে গেলে নিশ্চত আশ্রয় পাবো।"

উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করে নোরা: "ওরা এত হৈ-হৈ করছিল কেন?"



শকুনি ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে আসছে—আর কখনো পাখার ঝাপটা মারছে,...

কণ্ঠে বিরক্তির সুর এনে বলে সানি : "ওদের কথা আর বলো না মিস্। ওরা আমাদেরই জাতের লোক হলেও আমাদের গোষ্ঠীর সঙ্গে ওদের গোষ্ঠীর বনে না। আমাদের এ সমস্ত বন্য জাতির রাজনীতি তুমি বুঝবে না। একেই তো ওরা আমায় পছন্দ করে না, তার উপর আবার তোমার সাদা চামড়া দেখেছে। তোমাকে সাহায্য করতে ওরা কিছুতেই রাজী নয়।"

"কিন্তু এর জন্যে পিস্তল বাগানোর কি দরকার ছিল ?"

"ও কথা আর তুমি জানতে চেয়ো না। আমাদের বুনোদের কথা —ও তোমার শুনে কাজ নেই।"

যা হোক্, বুনোরা আগে আগে চল্লো। সানি তাদের পিছনে আর সানির অনুসরণ করছে নোরা।

চারজনে ডোঙ্গাতে উঠতেই বুনোদের একজন নিল হাল, আর একজন বৈঠা। এবার নৌকা আর স্রোতের টানে চল্লো না—নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে যাবার জন্যে তৈরী হল।

সানি এবং নোরা দু'জনেই ক্লান্ত—নৌকায় বসে বসেই ওরা ঝিমুতে থাকে। কিন্তু এর মাঝেও সানি একেবারে অসতর্ক হয়ে পড়েনি, পিস্তল তার হাতে বাগানোই আছে।

ওরা প্রায় ওপারের কাছাকাছি এসেছে, অকস্মাৎ নৌকাটা টলে ওঠে। যেন টাল সামলাতে না পেরেই একটা বুনোর হাত থেকে বৈঠা পড়ে যায়—সানিও একটু বেসামাল হয়ে একদিকে কাত হয়ে পড়ে। হঠাৎ নৌকাটা একেবারে উলটে যায়। সকলেই জলে পড়ে যায়। সানি শুনতে পায় নোরার আর্তকণ্ঠ—তাকিয়ে দেখে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে নোরা, তবু সে প্রাণপণে চেষ্টা

করছে জলের ওপর ভেসে থাকতে। বুনো ছুটো ডাঙ্গার দিকে সাঁতরাচ্ছে।

ভাববার আর সময় ছিল না। এগিয়ে গেল সানি সামনের দিকে। তার পরেই সে মুঠি করে ধরে নোরার চুল। এক হাতে তার পিস্তল, ভিজতে দেয় না ওটাকে। ছুই হাত তার বন্ধ, কাজেই শুধু পায়ের জোরে সে এগুতে পারে না বেশী।

নোরাকে চেঁচিয়ে বলে সে, "মিস্, তুমি একটা হাত ওপরে তুলে পিস্তলটা ধরে রাখো, জলে ভিজে না যায়—আমি আর পারছিনে।"

নোরা ওর কথার জবাব দিল না—আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, "কুমীর। কুমীর।"

নোরার চিৎকার শুনেই সামনের দিকে তাকালো সানি। দেখলো সামনেই জলের নীচে তোলপাড় হচ্ছে—আর তা' তাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে।

সে নোরাকে টেনে নিয়ে একদিকে সরে গেল—আর ঠিক সেখানেই সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হল বিরাটকায় কুমীরের একটা মাথা।

এ দৃশ্য দেখে উভয়েই শিউরে উঠলো। কিন্তু ভাবনার সময় ছিল না। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই যেন সানির হাত থেকে আপনি গুলি বেরিয়ে গেল, আর একটা বিরাট তোলপাড় শুরু হল জলে। রাঙা হয়ে উঠলো জল।

ভয়ে নোরা নদীর বুকেই মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

হতাশ টারজান

বড় মনমরা হয়ে পড়েছে টারজান। পোড়া শিবিরের কাছেই একটা গাছে সে আশ্রয় নিয়েছিল—হয়ত ভরসা করেছিল সেই সাদা মেয়েটাকে আবার সে ফিরে পাবে। ওরা হয়তো আবার এখানে ফিরে আসবে।

ভাবে টারজান—ঘরের টান বড়ো টান, সে তো গাছে গাছেই দিন কাটায়; তবুও মাঝে মাঝে আস্তানার জন্যে মন কেমন করে ওঠে। তবুও আস্তানায় ফিরে যায় না সে। কি যেন হারিয়েছে সে—সেটা খুঁজে না পেলে আস্তানায় ফিরবে না কোন মতেই।

বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন সে একটা নতুন শিবির দেখতে পেল। সাদা সাদা অনেক লোকও এসে জমা হয়েছে ওখানে। কিন্তু ভালো করেই তাকিয়ে দেখেছে টারজান—ওখানে সেই সাদা মেয়েটা তো নেই-ই, এমন কি তার পরিচিতও কেউ নেই। তবুও তার আশপাশেই ঘুরে বেড়ায় টারজান।

টারজানের গতিবিধি অত্যন্ত সতর্ক—সে এমনভাবে ঘুরে বেড়ায় যে, সে প্রায় সব কিছুই দেখতে পায়, অথচ সে কারো চোখে পড়ে না। কিন্তু একেবারেই যে পড়ে না, তা নয়। একদিন রাতে পাহারাদারের চোখে পড়ে গেছে। সে মনে করেছিল তাকে একটা ভূত।

ডাঃ মরিসন সেই ভূতের গল্প শুনে এবং টারজানের গলার আওয়াজ শুনেই ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁদের প্রার্থিত অর্ধমানবটি ধারে-কাছেই আছে। তাই তিনিও নিজে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন ওদিকে। আর শিবিরের সবাইকে বলে রেখেছেন যেন ওর উপর কোন আঘাতই না

পড়ে। তিনি নিজে দূর থেকে টারজানকে দেখেছেন—কিন্তু কী ভাবে তাকে পাকড়াও করবেন, তা' তখনও বুঝে উঠতে পারছেন না।

সত্যিই মনমরা হয়ে আছে টারজান। সে একবার মানুষের সংসর্গ পেয়েছে—বন্য বন্ধুদের সাহচর্য আর তাকে আশ্বাস দেয় না। কাজেই ওদিকে আর পারতপক্ষে সে যেতে চায় না। কখন কখন ওরা আসে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু মনের আনন্দে আর তাদের সঙ্গে খেলা করতে পারে না। হাতীবন্ধু আসে মাঝে মাঝে। একমাত্র ওর সঙ্গেই যা কিছু ভাব এখনও রয়েছে। হাতীবন্ধুর পিঠে চড়ে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়িয়ে মনটাকে শান্ত করে।

অজগরের ক্রোধ

সেদিন সকালবেলা উঠেই তার মেজাজটা গেল বিগড়ে। দিব্যি ঘুমিয়ে ছিল—আচমকা কিসের স্পর্শে সে উঠলো জেগে। তাকিয়ে তার চোখ একেবারে ছানাবড়া। একটা অজগর তাকে জড়িয়ে ধরছে। খুব বড়ো নয়, কিন্তু উপেক্ষা করবার মত আকৃতি তার নয়। ভাগ্যিস্, প্যাঁচটা ভালো করে দিয়ে উঠতে পারেনি—তাই রক্ষা, নইলে এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ ছিল না।

টারজান একহাতে ওর মাথাটাকে চেপে ধরে আর এক হাতে একটা পাথর নিয়ে ঠুকছে ওর মাথাটাকে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অজগরটি টারজানের দেহে প্যাঁচ কসবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আর টারজান প্রাণপণ চেষ্টা করছে বন্ধনমুক্ত হবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত জয় হলো টারজানেরই। গাছের একটা ডালের সঙ্গে ওটাকে

পেঁচিয়ে দিল এক টান। সেই টানেই মরে গেল সেটা। কিন্তু তবুও টারজানের রাগ পড়েনি। সে যেন ওটাকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

সকালবেলার এই ঘটনাই টারজানের মনটাকে বিগড়ে দিয়েছিল। ওটার ভবলীলা শেষ করে টারজান বেরিয়ে পড়লো তার আস্তানার দিকে—ক'দিন আর ওদিকে যাওয়া হয়নি।

গুহাটার দরজায় দাঁড়িয়েই সে টের পেলো ভিতরে অন্য কেউ আছে। জোরে জোরে শ্বাস টেনে সে বুঝতে চেষ্টা করলো—কে আছে ওখানে। না—পরিচিত কোন গন্ধ সে পাচ্ছে না, কাজেই শত্রুই হবে।

একটা বড় পাথরকে সে দু'হাতে ঠেলে ঠেলে নিয়ে এলো গুহার মুখে—তারপর সেটাকে দিল এক ধাক্কা। পাথর গড়িয়ে পড়লো গুহার ভিতরে। ভিতর থেকে শোনা গেল একটা গর্জন—বুকফাটা আর্তনাদ! টারজান এবারে বুঝল ওটা একটা চিতাবাঘের আর্তনাদ। বাইরে দাঁড়িয়ে বিকট উল্লাসে চিৎকার করে টারজান।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টারজান ছোরাটা বাগিয়ে ধরে ঢুকে যায় গর্তের ভিতরে। আবার খানিক পরে বেরিয়ে আসে একটা চিতার লেজ ধরে টানতে টানতে। চিতার দেহে তখন আর সাড়া নেই।

এবার একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লো টারজান। হাত দুটো শাঁকের মতো করে মুখের কাছে নিয়ে সে দিল এক ফুঁ—একটা তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে বনভূমি যেন সচকিত হয়ে উঠলো। মুহূর্ত পরেই বনের অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেল হাতীর ডাক। হাতীবন্ধু টারজানের আহ্বানে সাড়া দিতে একটুও দেরী করেনি।

মনের আনন্দে এগিয়ে চলছে টারজান—পথেই দেখা হবে গজ-রাজের সঙ্গে। আনমনে সে পথ চলছে।

অকস্মাৎ যেন এক অজানিত আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে। একটা অপরিচিত গন্ধে সে সহসা চমকে ওঠে। কিন্তু ভাববার আর অবসর পায় না—তাকে তাক করেই লাফিয়ে পড়লো এক সিংহ।

অনেক জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গেই টারজানকে লড়তে হয়েছে—সিংহের পাল্লায়ও যে দু'একবার পড়েনি তেমন নয়। কিন্তু এমন অতর্কিতে আর সে কখনও আক্রান্ত হয়নি। এর উপর আবার ক্লান্ত। তবু ঘাবড়ালো না সে।

টারজান জানে একটু অন্যমনস্ক হলেই তার প্রাণান্ত হবে। তাই সিংহটাকে লাফিয়ে পড়তে দেখেই একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল। সিংহ ঠিক তার পাশটাতেই লাফিয়ে পড়লো কিন্তু শিকারের উপর পড়তে পারলো না। ফিরে উঠেই আবার সে রুখে দাঁড়ালো—রাগে গর্‌গর্‌ করছে সে—ওদিকে টারজানও সামলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তার আর দৌড়ে পালাবার পথ নেই—কাজেই শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েই তাকে লড়তে হবে।

সিংহ যতবার লাফিয়ে পড়ে তার উপর, সে কেবল কৌশলে তাকে এড়িয়ে চলে। তারপর একবার সুযোগ বুঝে সে সিংহের গলা জাপটে ধরলো। শুরু হল তুমুল সংগ্রাম। সিংহের গর্জন এবং টারজানের গর্জন মিলে সমগ্র অরণ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করলো।

দুই মল্লযোদ্ধার মত তারা দু'জন লড়ে চলছে। একবার টারজান সিংহের উপর চড়ে বসে তো, পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ বিক্রমে সিংহ তাকে আক্রমণ করে। কিন্তু আর বুঝি পারে না টারজান! তার

শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ওদিকে দূরে শোনা যায় মত্ত-মাতঙ্গের দ্রুত পদক্ষেপ—এগিয়ে আসছে তার হাতীবন্ধু। কিন্তু ততক্ষণও বুঝি আর টারজান টিকে থাকতে পারবে না। তার সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে আসছে—চেপে ধরেছে, সিংহ তাকে। এই যে 'হাঁ' করে সে টারজানের মাথার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

সব শক্তিতে ভর করে টারজান এক ঝটকায় সিংহটার কবলমুক্ত হল। আবার উঠে দাঁড়াল সিংহ। টারজান তখন হাঁপাচ্ছে। এই বুঝি আবার আক্রমণ করে সে। এ আক্রমণের বেগ আর তাকে সামলাতে হবে না।

দূর থেকে গজরাজ বোধ হয় টারজানের বিপদ দেখতে পেয়েছিল। ছুটে সেই মুহূর্তে এসে পৌঁছে গেল সেখানে। একটা লাথি দিয়ে সিংহটাকে দিল কিছুটা তফাতে সরিয়ে। তারপর টারজানের দেহটাকে শুঁড় দিয়ে পিঠের উপর তুলেই সে দ্রুতপদে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

সপ্তম পর্ব

এই তো টারজান!

ডাঃ মরিসন দু-একজন সঙ্গী নিয়ে অরণ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। বনে বনে ঘুরে বেড়ানোই তাঁর নেশা। আজ অবশ্য তাঁর কয়েকটা উদ্দেশ্য ছিল। টারজানের সঙ্গে যদি একবার দেখা হয়ে যায়। রিচার্ড আর উইলসন-দম্পতিই বা গেলেন কোথায়? অথচ এই জঙ্গলেই তাঁরা রয়েছেন। টারজানও রয়েছে তাঁর আশেপাশেই। একটা প্রহেলিকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। হাতের কাছেই রয়েছে সে, কিন্তু নাগাল মিলছে না। মরিয়া হয়ে উঠলেন ডাঃ মরিসন—এদের খুঁজে বের করতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে তাঁদের চোখে পড়ল একটি মৃত অজগর সাপ। অতবড় বিরাট সাপ আগে তাঁরা দেখেননি। ভয়ংকর এই বিষধর সাপটাকে হত্যা করল কে? এ নিশ্চয় টারজানের কাজ। সাপটাকে অল্পক্ষণ আগেই মারা হয়েছে বলে মনে হল। তাহলে টারজান নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ আগে এদিকে এসেছিল। আতিপাতি করে তিনি খুঁজে চললেন বন-বাদাড়ের মাঝে।

হঠাৎ একটা বিকট শঙ্খনাদের মত আওয়াজে চমকে উঠলেন ডাঃ মরিসন। এ ধরনের শব্দের সঙ্গে তিনি পরিচিত আছেন। এ চিৎকার আর কারুর নয়—টারজানের। কিন্তু এ শব্দটা বিপন্নের করুণ আর্তনাদের মতই শোনাচ্ছে। তবে কি টারজান কোন বিপদে পড়েছে? রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে তাড়াতাড়ি সেই শব্দটা অনুসরণ



কিছুক্ষণ পরে চোখে পড়ল একটি মৃত অজগর সাপ।

করে এগিয়ে চললেন তিনি। বৈজ্ঞানিক হলে কি হবে—ডাঃ মরিসন একজন পাকা শিকারী। শিকারীর সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলো আজ তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে।

আবার সেই শঙ্খনাদ! শব্দটা খুব কাছেই। লক্ষ্য স্থির করতে তাঁর একটুও দেরি হল না। ছুটে চললেন তিনি সেই শব্দটার দিকে। তারপর একটা সিংহের ভীষণ গর্জন তাঁর কানে এল। তাহলে টারজানই একটা দুর্দান্ত সিংহের কবলে পড়েছে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ডাঃ মরিসন একেবারেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন।

সত্যই টারজানের সঙ্গে একটা বৃহৎ আকারের সিংহের যুদ্ধ হচ্ছিল। সিংহটা দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দুটো থাবা দিয়ে টারজানের ভবলীলা সাঙ্গ করতে চেয়েছিল। টারজান প্রবল পরাক্রমে তার থাবা দুটো ধরে রয়েছে। বাহুর পেশীগুলো তার অসম্ভব ফুলে উঠেছে। সিংহটা মুখ ব্যাদান করেছে সবটা। তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো তার সব বেরিয়ে রয়েছে। এখুনিই বুঝি টারজানকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তার দাঁতগুলো দিয়ে। টারজান তার সামনের পা দুটো এমন শক্ত করে ধরেছে যে, পশুরাজের নড়ন-চড়ন বন্ধ। টারজানও পরিত্রাহি চিৎকার করছে—সিংহটাও রোষে যথাশক্তি গর্জন করছে। সারা বনভূমি যেন থরথর করে কাঁপছে!

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না ডাঃ মরিসন। পাকা শিকারীর হাতের রাইফেল গর্জে উঠল। গুলিটা গিয়ে লাগল সিংহের ডান দিকের চোয়ালে। এমন এক লাফ মারল পশুরাজ যে টারজানের হাত ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে ধড়াস করে পড়ল সেটা। ঠিক এই সময়ে বন-বাদাড় ভেঙ্গে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কোত্থেকে ছুটে

এল একটা বিরাটকায় হাতী। ডাঃ মরিসন ভয় পেয়ে সরে দাঁড়ালেন। হাতীটা ছুটে এসেই টারজানকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল। পরম নিশ্চিন্তে টারজান তার পিঠের উপর বসে রইল। যেন হাতীটার সঙ্গে তার আগে থেকেই বলা-কওয়া ছিল। দু-চারবার গর্জন করেই সিংহটা চুপ করল। বোধ হয় একেবারেই চুপ করল সে। এ জন্মে তার মুখ দিয়ে একটিও রা বেরুবে না আর।

ডাঃ মরিসনের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি ভাবছিলেন টারজানের কথা। বিধাতার কি আশ্চর্য সৃষ্টি এই টারজান। মানুষের মধ্যে দানবীয় শক্তি! প্রাচীন গ্রীক ভাস্করেরা পাথর কেটে প্রকৃত বীরের মূর্তি কল্পনা করতো। কোন এক দৈব বলে সেই মর্মর-মূর্তির মধ্যে যেন প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রূপকথার সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে কল্পনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ডাঃ মরিসন বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষুধায় শরীরও আর বইছে না। সঙ্গে যে সব খাবার ও পানীয় ছিল, তাই দিয়েই তাঁরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন।

হাতীটার সঙ্গে টারজানের যে বন্ধুত্ব আছে সেটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু টারজানকে নিয়ে ওটা গেল কোথায়? নিশ্চয়ই ওদের একটা আড্ডা আছে। সেইখানেই গিয়েছে ওরা। আজ ওদের আড্ডা খুঁজে বের করতেই হবে। যে পথে হাতীটা গিয়েছিল সেই পথে আবার তিনি সঙ্গীদের নিয়ে অভিযান শুরু করলেন।

পথে মাঝে মাঝে দু-চারটে ছোটখাটো শিকারও মিলছিল। সেগুলো একজন সঙ্গী ব্যাগ ভরতি করছিল। শিবিরে খাবার চাই তো। ঘুরে ঘুরে শিকার করতে ডাঃ মরিসনের বেশ ভালই লাগছিল। জঙ্গলটার

এখানটা খুব ঘন। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে একটু-আধটু সূর্য-কিরণ প্রবেশ করে। বেলার আন্দাজ পাওয়া কঠিন। কাছে একটাও হাত-ঘড়ি নেই। হঠাৎ চমকে উঠলেন ডাঃ মরিসন। কতদূর এসে পড়েছেন তাঁরা? ফিরতে ফিরতে নির্ঘাত সন্ধ্যা হয়ে আসবে। এই গহন জঙ্গলে সন্ধ্যার পর শিবিরের বাইরে কতদূর যে নিরাপদ, তা তাঁর ভালরকমই জানা আছে। টারজানের আড্ডার সন্ধান তো মিললই না, উপরন্তু পথ চিনে ফিরে যাওয়াও সন্ধ্যার আগে সম্ভব নয়। ডাঃ মরিসন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গীরা বলল, কোন গাছে উঠে আজ রাত কাটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গাছে উঠে সারারাত জঙ্গলের নিশীথ-রূপ দেখবার আগ্রহ ডাঃ মরিসনের ছিল না। তিনি অন্য উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

দূরে একটা অস্পষ্ট জল-রেখা দেখা যাচ্ছিল। হয়ত কোন নদী বা ছোটখাটো জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। দূরবীন দিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করলেন তিনি। একটা নদীই বটে। এ অঞ্চলে একটা নদীই তো তিনি দেখেছেন। সেটা তাঁর শিবিরের পাশ দিয়েই চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। এটা যদি সেই নদীই হয়, তাহলে ওটার তীর ধরে সহজেই শিবিরে পৌঁছাতে পারবেন তিনি। তাতে যতক্ষণই সময় লাগে লাগুক। পথ গুলিয়ে বৃথা ঘুরে মরতে হবে না, বা বৃথা সময় নষ্টও হবে না। এখন এক মিনিট সময়েরও মূল্য আছে।

তাড়াতাড়ি তাঁরা নদীর তীরের দিকে এগিয়ে চললেন। শীঘ্রই তাঁরা নদীর তীরে পৌঁছে গেলেন। নদীর জল আর তার গতি লক্ষ্য করে মনে হলো—সেই নদীটাই হবে যেটা তাঁদের শিবিরের পাশ দিয়ে

এসেছে। মনে তাঁর ক্ষীণ আশা হল—এই নদী ধরেই তিনি হয়ত সন্ধ্যার আগে শিবিরে পৌঁছাতে পারবেন।

নদীর কিনারা ধরে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই ডাঃ মরিসন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বুকটা তাঁর আনন্দে নেচে উঠল। একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঘাসের দড়ি দিয়ে একখানা নৌকো বাঁধা রয়েছে। দুখানা দাঁড় আর একটা হাল তাতে লাগানো।

তিনি একজন সঙ্গীকে বললেন, "দড়ি কেটে দাও—তাড়াতাড়ি হাল বেয়ে সরে পড়ি চল। ভগবান একটা উপায় করে দিয়েছেন।"

সঙ্গে সঙ্গেই নৌকোর দড়ি কাটা হল। সঙ্গের শিকার আর মালপত্র যা ছিল নৌকোয় তুলে তাঁরা নৌকো ছেড়ে দিলেন। নদীতে স্রোত ছিল—আর সেই স্রোত তাঁদের অনুকূলেই ছিল। সোঁ সোঁ করে নৌকো ছুটল।

হঠাৎ সাঁ করে একটা তীর ডাঃ মরিসনের কান ঘেঁষে বেরিয়ে সপাং করে গিয়ে জলে পড়ল।

"কে তীর ছুঁড়ল?"—ডাক্তার তাকিয়ে দেখলেন, নদীর পাড় থেকে একদল বুনো জংলী তাঁদের আক্রমণ করছে। তাদের সকলেরই হাতে তীর-ধনু, কারো কারো হাতে টাঙি, বল্লম বা লম্বা লম্বা কুড়ুল—আরো কতো কি।

মুহূর্তের মধ্যে ডাক্তার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন—হাল ঘুরিয়ে তীরের দিকে নৌকো ভিড়িয়ে দিলেন। বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই ওরা থমকে দাঁড়াল। কয়েকজন অস্ত্র ফেলে দৌড় দিল। তারা হয়ত তাদের দলের লোকদের খবর দিতে ছুটল।

ডাঃ মরিসন তাড়াতাড়ি তীরে নেমে পড়লেন। বন্দুকের আরো একটা ফাঁকা আওয়াজ করে তাদের সংকেত করে অস্ত্র ফেলে দিতে বললেন। আশ্চর্য, তারা ডাঃ মরিসনের আদেশ পালন করে একান্ত অনুগতের মত দাঁড়াল। বন্দুককে এরা যে বড্ড ভয় করে ডাঃ মরিসন তা জানতেন।

ডাঃ মরিসনকে বন্দুক উঁচিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে, হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল। দুজন পালাতে পারল না। ডাঃ মরিসন তাদের ধরে ফেল্লেন। সংকেতে তাদের নৌকোয় অনুসরণ করতে বললেন, নইলে বন্দুক তুলে শাস্তির কথাটাও বুঝিয়ে দিলেন। অসমসাহসী শক্তিধর দুজন জংলী মানুষ একান্ত অনুগতের মত ডাক্তারের আদেশ পালন করে চলল। বন্দুকের গুণে বা সাদা চামড়ার গুণে কি করে এটা সম্ভব হল, জংলী দুটোই সেটা ভাল জানে।

ডাক্তারের আদেশ মত জংলী দুটো দাঁড় হাতে নিল আর ডাক্তার নিজেই হাল হাতে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিলেন। হুহু করে নৌকো ভাটার টানে ছুটে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁরা অনেকটা পথ পার হয়ে গেলেন। শীঘ্রই নদীটার চেনা তীর ডাক্তারের চোখে পড়ল। ঠিক পথেই চলেছেন বুঝে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

জংলীদের কবলে নোরা ও সানি

ডুবে যাবার সময় মানুষ খড়-কুটাকেও আশ্রয় করে প্রাণ বাঁচাতে চায়। মূর্ছিতা নোরাকে পিঠে নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সানিও সেই রকম মরা কুমীরটাকে জাপটে ধরল। কিছুক্ষণ আগে সাক্ষাৎ যমদূতের মতই কুমীরটাকে দেখেছিল ওরা, এখন সেই কুমীরটাকেই আশ্রয় করে বাঁচতে চায়;—অন্ততঃ একটু দম নিতে চায়। কিন্তু তা সম্ভব হল না। কুমীর সমেত ওরা জলের নীচে তলিয়ে যেতে লাগল।

বিপদ বুঝে সানি কুমীরটাকে ছেড়ে দিল। তারপর অতি কষ্টে ভেসে ভেসে তীরের দিকে এগিয়ে চলল। নোরাকে বাঁচাতেই হবে—এভাবে তার সলিল-সমাধি হতে দেবে না। তাতে নিজের প্রাণ যায়, একটুও দুঃখ নেই।

দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের জোরে সানি শীঘ্রই তীরে এসে গেল এবং মূর্ছিতা নোরাকে তীরভূমির শ্যামল ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে তার পরিচর্যা করতে লাগল। শীঘ্রই নোরা চোখ মেলে চাইল।

—"আমরা কোথায় সানি?"—ক্ষীণস্বরে নোরা জিজ্ঞাসা করল।

—"কুমীরের হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে তীরে এসে গেছি বোন।"—সানি বলল।

সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নোরা উঠে বসল। দেহ-মন তার ক্লান্ত, অবসন্ন—পরিচ্ছদগুলো সব ভিজে। একটা একটা করে সেগুলো নিংড়ে আবার পরে ফেলল। বলল "সন্ধ্যা হয়ে এল, আমরা এখন কোথায় যাবো?"

সানি বলল, "কাছেই লোকালয় আছে বলে মনে হয়। দেখি একটু খোঁজ করে, যদি কোথায়ও রাতটুকুর আশ্রয় মেলে।"

নদীর ধারেই সাধারণতঃ লোকালয় থাকে; এই আশাতেই সানি গ্রামের খোঁজে এগিয়ে চলল। নোরা তাকে ভর করে ধীর পায়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে। সত্যই সে ক্লান্ত—আহার-বিশ্রাম তার চাই।

সানির অনুমান মিথ্যা নয়। কাছেই একটা গ্রাম ছিল। দূর থেকে তার নিশানা দেখা গেল। কয়েকজন গ্রামবাসী একস্থানে জড় হয়ে জটলা করছিল। তাদের সকলের হাতেই মশাল।

আশায় আনন্দে সানির মুখখানি দীপ্ত হয়ে উঠল। এখানে নিশ্চয়ই রাতটুকুর আশ্রয় মিলবে। জোরে জোরে পা ফেলে ওরা এগিয়ে চলল।

নোরাকে দেখেই জংলীদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সানি এগিয়ে গিয়ে জংলী ভাষায় তার উদ্দেশ্যটুকু জানিয়ে দিল। উত্তরে তারা যা বলল, তাতে এক মুহূর্তে সানির সব উৎসাহ নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জংলীরা ওদের ঘিরে ফেলল।

"কি ব্যাপার সানি?"—আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল নোরা।

"আর বল কেন বোন, এক বিপদ কাটিয়ে উঠি তো আর এক বিপদ এসে পড়ে। যত সব জংলীদের কাণ্ড! কে এক সাদা চামড়ার লোক এসে ওদের দলের দুজন জংলীকে নাকি ধরে নিয়ে গেছে, তাই ওরা তাদের লোক দুজনকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের ছাড়বে না। মানে, তোমাকে ছাড়বে না।"

নোরা বলল, "বেশ তো কোন্ পথে গেছে সেটা জিজ্ঞাসা করে নাও। আর ওরা সঙ্গে আসুক, আমরা কথা দিচ্ছি—ওদের দলের

লোকদের ফিরিয়ে দেবো। আমাদের শিবিরের খোঁজ এতে সহজেই মিলে যাবে। নিশ্চয় আমাদেরই কেউ এসে ওদের ধরে নিয়ে গেছে।"

সানি সেই কথাই বলল ওদের মোড়লকে ডেকে। কিন্তু এ প্রস্তাবে তারা রাজী হল না। সাদা লোকদের কাছে বন্দুক আছে—সেখানে তারা যেতে রাজী নয়।

নোরা বিরক্ত হয়ে বলল, "দূর হোকগে ছাই। এখন ত বিশ্রাম করা যাক, পরের কথা পরে চিন্তা করা যাবে।"

সানি ও নোরাকে ঘিরে নিয়ে জংলীরা গ্রামের বসতির দিকে চলল। ওরা নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করল। রাতটুকু তো নিরাপদে থাকতে পারবে ওরা।

অপরাজেয় টারজান

সিংহের সঙ্গে লড়াই করে টারজান কাবু হয়ে পড়েছিল। সিংহটা তার শরীরে থাবা বসাতে পারেনি, কিন্তু আঁচড়ে-কামড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। সেই ঘা না শুকানো পর্যন্ত তার সারা দেহে ভীষণ বেদনা বোধ হতে লাগল। তাই সে একটা গাছে আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম করছিল ক'দিন। তার হাতীবন্ধু এসে এসে তাকে ফল-পাকড় খাইয়ে যেত। গাছের ডালে চুপটি করে শুয়ে থাকে টারজান। শরীর তার বেশ সুস্থ হয়ে গেছে। তবুও জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে তার মন চায় না।



দরজায় দমাদম লাথি পড়তে লাগল।

দুর্দান্ত জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করে যেন আগের মত আত্মতৃপ্তি বোধ করে না সে। মনের মাঝে সর্বদাই যেন তার হুহু-করে। কী যেন পেয়েছিল, কী যেন হারিয়েছে সে। যতদিন না সেই হারানো বস্তুটির সন্ধান সে পাবে ততদিন তার মন সুস্থির হবে না।

একদিন হাতীবন্ধুর অনুরোধে বেশ খানিকটা পথ সে তার পিঠে চড়ে ঘুরে এল। কিন্তু মনের শান্তি কোথায়?

একদিন এই রকম আনমনা হয়ে হাতীবন্ধুর পিঠে চড়ে নদীর ধার ধরে চলেছে। পাশ দিয়েই তরতর করে নদী বয়ে যাচ্ছে। জল কল-কল ছল-ছল করে যেন তাকে ডাকে। বলে, 'চলে এসো বন্ধু', কতদিন তো তোমার ছুটোপাটি বন্ধ রয়েছে। তোমার হল কি?'

আর স্থির থাকতে পারে না টারজান—হাতীর পিঠে দাঁড়িয়ে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর মাঝে। তারপরই দেয় এক ডুব। তীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তার হাতীবন্ধু। কিছুক্ষণ পরেই ভেসে ওঠে টারজান। হাতে তার একটি বিরাট আকারের মাছ। মাছটাকে একবার দিল সে শূন্যে ছুঁড়ে। পর-মুহূর্তেই আবার লুফে নিল সেটাকে। আবার ছুঁড়ল উপরের দিকে। এবারে আর ধরতে পারল না। মাছটা ফসকে জলের ভিতর পড়ে যায়, আর চোঁচা দৌড় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে টারজানও ডুবল। অনেকক্ষণ আর টারজানের দেখা নেই। অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে তার হাতীবন্ধু। হঠাৎ হাতীটা ভীষণ চিৎকার করে উঠল। টারজান উঠেছে—একটা কুমীর তাকে জাপটে ধরেছে লেজ দিয়ে। দু'জনেই জলের ওপরে ভাসছে। টারজান সেই অবস্থায় কুমীরটার পিঠে চেপে বসে চোখ দুটো তার আঙুল দিয়ে টিপে ধরল। সে টিপুনী বোধ হয় কুমীর-তায়া সহ্য

করতে পারছে না। নদীর জলে ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। প্রবল বিক্রমে কুমীরটা টারজানকে জড়াচ্ছে। তীরে দাঁড়িয়ে হাতীটা পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল।

নদীর ওপারে একদল বুনো জংলী সেই চিৎকার শুনে ছুটে এল। টারজানকে তারা চিনতো। দূরে দাঁড়িয়ে তারা টারজানের লড়াই দেখতে লাগল। তারা জানতো টারজানের হাতে কুমীরটার মৃত্যু অনিবার্য, আর তারা টাটকা কুমীরের মাংসে মহা আনন্দে আজ ভোজ লাগাবে। আকুল আগ্রহে তারা কুমীরটার পরিণতির কথাই ভাবছিল। এমন সময়ে কুমীরটা টারজানকে নিয়ে জলের নীচে ডুবে গেল।

একি হল? আজ হয়ত কুমীরের হাতে টারজানের লীলা-খেলা শেষ হয়! জলের ভিতরে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করবে এমন বীর তো মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। কাজে কাজেই তারা নানা রকমের কথাবার্তা বলতে লাগল। এপারে তার হাতীবন্ধুর চোখে জল। হায়, টারজানকে কেন সে এখানে নিয়ে এসেছিল? কী অশুভ মুহূর্তেই না তারা যাত্রা করেছিল।

কিছুক্ষণ পরে ভেসে উঠল টারজান। কুমীরটা নেই—শুধু টারজান কুমীরের কবলমুক্ত। আনন্দে হাতীটা চিৎকার করে ডেকে উঠল। কিন্তু টারজান চারদিক চেয়ে কী যেন খুঁজছে! ধীরে ধীরে ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে চলেছে টারজান। যে দিকে হাতীটা আছে সেদিকে নয়—যেদিকে জংলীরা আছে সেইদিকে। হঠাৎ কুমীরটা ভেসে উঠল তীরের কাছেই। সাঁতরে গিয়ে টারজান তাকে জড়িয়ে ধরল। এবারে সে পায়ে ডাঙ্গা পেয়েছে আর রক্ষে আছে

কি কুমীর-ভায়ার? দু'হাতে কুমীরের চোখ টিপে ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে ডাঙ্গায় তুললো। কুমীরটা মরেনি তবে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

জংলী গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। জীবন্ত কুমীর ভোজের জন্য পাওয়া তাদের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না। তারা টারজানকে হাত তুলে বাহবা দিল আর তাদের ভোজে টারজানেরও নিমন্ত্রণ, একথা জানিয়ে দিল।

বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল টারজান। ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে। ছি, ছি! ওপারে তার হাতীবন্ধু এখনও অপেক্ষা করছে! সে কি মনে করবে? টারজান দু'হাত মুখের কাছে নিয়ে সেই পরিচিত শঙ্খনাদে হাতীবন্ধুকে অভিবাদন জানাল।

টারজানের চিৎকার থেমে যেতেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঠিক সেই রকম শঙ্খনাদে কে যেন চিৎকার করে উঠল, "টারজান—টারজান!"

চমকে উঠল টারজান। শিরায় শিরায় তার দ্রুত রক্ত সঞ্চালন হতে লাগল। সটান দাঁড়িয়ে উঠে আবার সে সেই ভাবে ডেকে উঠল, "নোরা—নোরা!"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রত্যুত্তর এল, "টারজান—টারজান!"

বিদ্যুদ্‌গতিতে টারজান ছুটে চলে গেল গ্রামের বসতির দিকে, জংলীরা তখন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে কুমীরটাকে ঘিরে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

যুদ্ধযাত্রা

মিঃ রিচার্ডের দলবল যুদ্ধের সাজে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে মিঃ রিচার্ড বলে উঠলেন—"হল্ট্।"

সৈন্যদলের অধিনায়কের মতই কথাটা সকলের কানে গিয়ে পৌঁছাল। সকলেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সকলের হাতেই পিস্তল, বন্দুক, জংলীদের মত টাঙি, বল্লম আরো কত কি অস্ত্র।

মিঃ রিচার্ড এগিয়ে এসে সৈন্য সাজাতে আরম্ভ করলেন। দলের সব লোকজনদের কয়েক ভাগে ভাগ করে আলাদা আলাদা দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাইফেলধারীরা রইল সামনে। তাদের ডানপাশে আর বামপাশে থরে থরে দাঁড় করালেন দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত দুইটি দল। বড় বড় কয়েকটি গাছের পিছনে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখা হল পিস্তলধারীদের।

অল্প-সংখ্যক লোক দিয়েই অনেকখানি জায়গা জুড়ে সৈন্য সাজানো হল। মিঃ রিচার্ড, মিঃ আয়রনসাইড আর মিঃ উইলসন রইলেন একটা বড় ঝোপের আড়ালে। সেখান থেকে রাইফেল বাগিয়ে তাঁরা অবস্থা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

মিঃ উইলসন ফিসফিস করে বললেন, "খুব ভাল সৈন্য-ব্যূহ-রচনা করা হয়েছে। একটা খণ্ড-যুদ্ধের পক্ষে আমরা বেশ ভাল ভাবেই তৈরী হতে পেরেছি, ভগবানকে ধন্যবাদ। কিন্তু যদি—"

"যদি দলে ওরা খুব ভারী হয়?"—মিঃ রিচার্ড জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন মিঃ উইলসনের দিকে।

"হ্যাঁ, সেই কথাই ভাবছি।"

মিঃ রিচার্ড বললেন, "বহুদিন অরণ্য-বাস করে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা থেকে আমার মনে হয় ওরা দলে দলে বাস করে বটে, কিন্তু একদলের সঙ্গে আর একদলের একতার অভাব। আমাদের সঙ্গে একদলের যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে আর একদল দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। ওরা যদি কয়েকটা দল এক হয়ে আমাদের আক্রমণ করত তাহলে আমাদের এক দিনও এই অরণ্যে বাস করা সম্ভব হত না। আমি জানি ওদের একদলে ত্রিশ-চল্লিশ জনের বেশী লোক নেই। আর ত্রিশ-চল্লিশটা জংলীকে ঘায়েল করতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হবে না।"

"কিন্তু যদি ওরা দলে একশো-দুশো হয়?"—মিঃ উইলসন প্রশ্ন করলেন।

"এক একটা দলে একশো-দুশো নেই যে একথা বলছি না—তখন সৈন্য সাজাতে হবে অন্য ভাবে।"

মিঃ রিচার্ড একখানা যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ পকেট থেকে বের করে মিঃ উইলসনের হাতে দিলেন। বললেন—"এই চার্ট নেপোলিয়নের হাতে তৈরী। অনেক যত্ন করে এইসব চার্টের নকল আমি সংগ্রহ করে রেখেছি। নিজেদের শক্তি অনুযায়ী শত্রুপক্ষের দলগত শক্তির একটা আন্দাজ করে নিয়ে চোখ বুজিয়ে এই চার্ট ধরে চলো—জয় হবেই।"

মিঃ উইলসন অবাক্ হয়ে চার্ট পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মিঃ রিচার্ড বললেন, "আজকালকার সভ্য জগতের যুগে যদিও এসব চার্টের কোন মূল্য নেই, কিন্তু আমাদের কাছে এগুলি এখন

অমূল্য। সব বিষয়ে তৈরী না হয়ে লোকালয় ছেড়ে এই গহন অরণ্যে বাস করা কি সম্ভব ?"

কিন্তু জংলীরা তো আর এগুচ্ছে না। সেই একই ভাবে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে সে উত্তেজনাও আর দেখা যাচ্ছে না। শিবির থেকে যে দশজনকে পাঠানো হয়েছিল, তারাই বা ফিরছে কই ? শত্রুরা তাদের মেরে ফেলে তাঁদের পিস্তলগুলো হস্তগত করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্চে না তো ?

চিন্তার কথা বটে। মিঃ রিচার্ডের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিঃ রিচার্ড পকেট থেকে একখানা ডায়েরির মত বই বের করে কী সব দেখতে লাগলেন। তারপর বইখানি বন্ধ করে পকেটে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

মিঃ উইলসন, মিঃ আয়রনসাইডও উঠে দাঁড়ালেন।

"কি ব্যাপার ?—কি দেখলেন ?"——মিঃ উইলসন প্রশ্ন করলেন।

"আমাদের যদি আক্রমণ করতে হয়, তাহলে কি ভাবে এগুতে হবে সেইটাই দেখে নিলুম। চলুন—আর দেরি করা চলবে না। আমাদের দিক থেকেই শেষ পর্যন্ত আক্রমণ শুরু করতে হল দেখছি। জয়, পরাজয় বা সন্ধি যা হোক কিছু একটা এখনই মীমাংসা করতে হবে। ঘরের কাছে শত্রু বসিয়ে রেখে বাস করা সম্ভব নয়।"

"তবে সন্ধিটাই আমি পছন্দ করছি বেশী। সেই ভাবেই আমরা আক্রমণ চালাব যাতে ও তরফ থেকে সন্ধির প্রস্তাবটা আগে আসে। ওদের কাছে দুর্বলতা স্বীকার করা চলবে না, তা হলেই ওরা পেয়ে বসবে।"

ঠিক যেভাবে সৈন্য সাজানো হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থা বজায় রেখে শিবিরবাসীরা এগিয়ে চলল। তাদের সামনে রইলেন রাইফেল উঁচিয়ে মিঃ রিচার্ড, মিঃ উইলসন আর মিঃ আয়রনসাইড। ঠিক যেন একটা দাবার ছকের উপর ঘুঁটিগুলো সাজানো রয়েছে, আর মিঃ রিচার্ডের পরিচালনায় এক পা এক পা করে তারা এগুচ্ছে সেগুলো নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে। এখনই তারা পৌছে যাবে শত্রুদের একেবারে মুখোমুখি—ঐ তো দেখা যাচ্ছে জংলীদের কিম্ভূত-কিমাকার অস্পষ্ট মূর্তিগুলো। ঐ তো শোনা যাচ্ছে তাদের কোলাহল।

ক্রমশঃ জংলীদের মূর্তিগুলো স্পষ্ট দেখা গেল—কিন্তু তাদের মধ্যে কোন হিংসার ভাব নেই। বরং হাসি-গল্পেই যেন মেতে আছে তারা। যাই হোক জংলীদের তো বিশ্বাস করা যায় না। মিঃ রিচার্ড গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, "কুইক মার্চ।"

তালে তালে দ্রুত পা পড়তে লাগল রিচার্ড-সৈন্যের। অধিনায়ক তিনজনের ভারী বুটের একতালে মসমস শব্দ পিছনের শিবিরবাসী সৈন্যদের প্রেরণাই যোগাচ্ছিল হয়ত। তাদের মধ্যে যুদ্ধের উত্তেজনাই জেগে উঠেছিল।

এবারে মিঃ রিচার্ড একাই পরিচালনা করবার ভার নিলেন। মিঃ উইলসন আর মিঃ আয়রনসাইড রইলেন তাঁর পিছনে—দুপাশে।

জংলীরা দেখল মিঃ রিচার্ড সদলবলে এগিয়ে আসছেন। উভয় দলের মধ্যে আর কয়েক গজ মাত্র ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু তখনও তাদের আক্রমণ করা বা আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কোন রকমই

চেষ্টা নেই। নিজেদের মধ্যে হল্লা করছে দুর্বোধ্য-ভাষায় আর অদ্ভুত ভঙ্গিমায়।

হঠাৎ বিশালদেহ একজন জংলী সোজা এগিয়ে এলো মিঃ রিচার্ডের দিকে। মিঃ রিচার্ড দেখলেন তার অঙ্গে যুদ্ধের সাজ-পোশাক নেই। সাধারণ বুনো জংলীর সাজ। মাথায় বিরাট এক মুকুট, তাতে নরমুণ্ডের কঙ্কাল আঁকা। যুদ্ধের সময় তারা এক অদ্ভুত ভাবে নিজেদের সজ্জিত করে। সর্বাঙ্গে উলকি এঁকে নেয়, মাথায়, কোমরে পালক গোঁজে—প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে তাদের চোখে—মূর্তি হয়ে ওঠে দানবের মত। তবে কি ওরা যুদ্ধ চায় না।

মিঃ রিচার্ড আবার আদেশ দিলেন, "হল্ট্।" তাঁর সৈন্য-সামন্ত থেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মিঃ রিচার্ডও থেমে দাঁড়িয়ে রইলেন। জংলীটা এগিয়ে এল। তার পিছনে আরও পাঁচ-সাতজন অস্ত্রধারী জংলী এগিয়ে আসছে, কিন্তু সকলের মুখই অতি সাধারণ, একটুও উত্তেজনা নেই কোনখানে।

মিঃ রিচার্ডের বুক দুরুদুরু করলেও অসম সাহসে তিনি জংলীদের কাছে আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বিরাটদেহ জংলীটাই সকলের আগে এগিয়ে এসে দূর থেকে ইঙ্গিতে মিঃ রিচার্ডকে বন্দুক নামাতে বলল। রাইফেল আর একজনের হাতে দিয়ে যখন মিঃ রিচার্ড জংলীটার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তিনি দেখলেন জংলীটা হিহি করে হাসছে। সব দাঁতকটা তার বেরিয়ে পড়েছে। ভীষণ আকৃতি মানুষের কদাকার মুখের হাসি, এ হাসিতেও যেন বিভীষিকা ফুটে রয়েছে।

জংলীটাকে দেখে সর্দার গোছের একজন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার এই হাসির অর্থ কি? দুর্দান্ত এক দানব শিকার হস্তগত করে যে হাসি হাসে, একি সেই হাসি? তবে কি ওরা নিশ্চিন্ত যে সাদা-চামড়ার দলকে ওরা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে—

তা হলে মস্ত বড় ভুল করছ জংলী সর্দার। সাদা-চামড়াকে এখনও চেনোনি তাহলে। তোমাদের মত একটা জংলী দলকে হঠাতে তিনজন সাদা-চামড়ার হাতের তিনটে রাইফেলই যথেষ্ট।

দেখতে দেখতে আরো দশ-পনের জন জংলী এসে শিবির বাসীদের ঘিরে দাঁড়াল। সকলের হাতেই একটা না একটা অস্ত্র, কিন্তু মুখে উল্লাসের চিহ্ন।

মিঃ আয়রনসাইড্‌ দেখলেন ব্যাপার ভাল নয়। মিঃ রিচার্ড কর্তব্য ঠিক করতে পারছেন না। তিনি চিৎকার করে সর্দারকে বললেন—"তোমাদের মতলব কি? আমাদের দশজন লোককে কোথায় রেখেছ?"

উত্তরে জংলী সর্দার মিঃ আয়রনসাইড্‌কে তাদের জংলী ভাষায় কি যে বলল মিঃ রিচার্ড না বুঝলেও মিঃ আয়রনসাইড্‌ তা বুঝলেন। তিনি জংলীদের ভাষা বেশ ভালই আয়ত্ত করেছিলেন। জংলীরা বন্ধুত্ব করতে চায়।

মিঃ রিচার্ড শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, "কিন্তু আমাদের দশজন দলের লোক কোথায় গেল?"

মিঃ আয়রনসাইড্‌ বললেন, "তারা এখন নিমন্ত্রণ খেতে ব্যস্ত। —আমাদেরও আজ নিমন্ত্রণ ঐ জংলীদের আস্তানায়।"

মিঃ রিচার্ড হাসলেন। বললেন, "তাদের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ জংলীরা বন্ধুত্বই বা করতে চাইছে কেন?"

কিন্তু যখন জংলীরা হেসে হেসে অভ্যর্থনা জানাতে লাগল, মিঃ রিচার্ড তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। জংলী সর্দার এগিয়ে এসে হাতখানা বাড়িয়ে দিল। মিঃ রিচার্ডও হাত বাড়ালেন। অতি আড়ষ্টভাবে জংলীটা মিঃ রিচার্ডের করমর্দন করল। মিঃ রিচার্ড বুঝলেন করমর্দন করাটা সে নূতন শিখেছে।

* * * *

জংলীদের আস্তানা দেখে মিঃ রিচার্ড ও মিঃ উইলসন হেসেই খুন! শুধু গাছের গুঁড়ি আর লতাপাতা দিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ের মত খাড়া করেছে। তার মধ্যে থেকে বন্যজন্তুদের হাত থেকে বাচ্চা-কাচ্চাদের কি করে যে ওরা রক্ষা করে তা বোঝা গেল না। তবে যে জায়গাটুকুতে ওরা বাস করে সেটুকু পরিষ্কার ঝরঝরে। দিনে নিজেরাই পাহারা দেয় আর রাত্রে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে শুকনো গাছপাতায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দেখে আর বন্য-জন্তুরা নাকি সেদিকে যায় না। উপরন্তু বন্য-জন্তুদের ওরা ভয় করে না। ওরা তাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে ভয় করে চিরকাল বাস করা চলে না—এটাই তাদের মত।

মিঃ রিচার্ড প্রথমেই তাঁদের প্রেরিত লোকদের সঙ্গে দেখা করলেন। তারা যা বললে তা শুনে মিঃ রিচার্ড অবাক্ হয়ে গেলেন।

ওরা শত্রুতা চায় না বন্ধুতা চায়। শীঘ্রই ওদের দলের সঙ্গে আর একটি বড় দলের যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা আছে। তখন ওরা তাঁদের সাহায্য চায়। মানে তাঁদের পিস্তল ব্যবহার করবার জন্য চায়।

"কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে পিস্তলের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ হল কেন?" মিঃ রিচার্ড জিজ্ঞাসা করলেন একজনকে।

"কি করে পিস্তল ছুঁড়তে হয় জংলীরা দেখতে চাইল—আমরা পিস্তল ছুঁড়ে দেখিয়ে দিলুম—"

"পিস্তলগুলো কোথায়?"

"সব আমাদের কাছেই আছে।"

"বন্ধুত্ব করতে আমাদের আপত্তি নেই জংলী সর্দারকে আমাদের শিবিরে নিমন্ত্রণ করে চল আমরা ফিরে যাই। একদিক থেকে আমাদের একটা দুর্ভাবনা কাটল তাহলে।"

কোথায় নোরা?

"টারজান—টারজান!"—আবার সেই মনুষ্য কণ্ঠধ্বনি।

দানবীয় শক্তিতে ভর করে ছুটে চলে টারজান। গাছগুলোর দিকে এক একবার চেয়ে দেখে, এদিকের গাছগুলোতে ঝুরি নেই। তাহলে ঝুরি ধরে ধরে তিন লাফে সে পৌঁছে যেত যেখান থেকে নোরার ডাক এসেছে সেইখানে।

গ্রামের বসতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে টারজান। একটার পর একটা জংলীদের কুঁড়েগুলো আতিপাঁতি করে খুঁজে চলেছে—কোথায় নোরা।

কী মূর্তি হয়েছে টারজানের। চুলগুলো তার খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে, বাহুর পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে! আর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

কুমীর শিকারের কাহিনী তার আগেই জংলী বসতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহানন্দে জংলীরা নদীর ধারে গিয়ে জমা হয়েছে—পুরুষ বলতে একটিও প্রাণী গাঁয়ের মধ্যে নেই, কাজে কাজেই টারজানকে বাধা দেবারও কেউ নেই। বাধা দিতে এলেও কারুর আজ আর নিস্তার ছিল না টারজানের হাতে। টারজান আজ ক্ষেপে উঠেছে। অর্ধমানব অর্ধদানব টারজানের অন্তর্নিহিত দানব প্রবৃত্তি আজ প্রকট-রূপ ধারণ করেছে। একটা একটা করে জংলীদের কুঁড়েগুলো ভেঙ্গে তছনছ করতে আরম্ভ করল টারজান।

"টারজান!"

"নোরা—আ—আ—" সঙ্গে সঙ্গে টারজানের মুখ থেকে অদ্ভুত ধ্বনিটুকুও বেরিয়ে এল।

পাশের একটা অর্গলবদ্ধ কুঁড়ের ভেতর থেকেই শব্দটা আসছে বলেই মনে হল।

শক্ত শক্ত গাছের গুঁড়ি দিয়ে কুঁড়েখানা খাড়া করা হয়েছে। শক্ত গাছের গুঁড়ি কেটে তার দরজা তৈরি করা হয়েছে, কাঠের গোঁজে ঠুকে শক্ত করে মেরে স্থায়িভাবে দরজাটা বন্ধ করা আছে। দরজার সামনে একজন জংলী পাহারাদার।

গুড়ি মেরে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল টারজান। টারজানকে দেখেই পাহারাদার বল্লম ফেলে দে-দৌড়। দরজার গায়ে টারজান কানটা তার খাড়া রেখে অতি করুণস্বরে ডাকল, "নোরা!"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে প্রত্যুত্তর এল তেমনই করুণভাবে —"টারজান।"

আর কে ঠেকিয়ে রাখবে টারজানকে? দরজায় দমাদম লাথি পড়তে লাগল। ভিতর দিক্ থেকেও বোধ হয় সুদৃঢ় কোন কিছুতে বন্ধ রাখা হয়েছে দরজাটা। দরজাটা খুলল না। শুধু এক একবার ঘরসুদ্ধ কেঁপে উঠতে লাগল তার লাথির ঘায়ে। আর দু-চার ঘা লাথি পড়লে কী হত বলা যায় না, অত ধৈর্য বোধ হয় ছিল না টারজানের। একলাফে ঘরের চালের ওপর উঠে পড়ল সে! চালের ওপর দুটো লাথি পড়তেই চালসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে গেল টারজান ঘরের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে নোরাকে কাঁধে তুলে দুই লাথিতে ঘরের কাঠের দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়ল সে বাইরে। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে একেবারে গহন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। একটা বড় গাছের উপর নোরাকে তুলে গাছের ডালে তাকে বসিয়ে কিছুক্ষণ দম নিতে লাগল সে। যুদ্ধজয়ের তৃপ্তি ফুটে উঠেছে টারজানের চোখে মুখে। কিন্তু এখনও তার রোষ কমেনি! রাগে ফোঁসফোঁস করছে টারজান আর নদীর ওপারে ঘন ঘন চাইছে। নদীর ওপারেই যে তার বাসা। আবার কুমীরভরা নদীটা নোরাকে নিয়ে পার হতে হবে; এখন আর কুমীরের সঙ্গে লড়াই করবার মত মনের অবস্থা তার নেই। মনের অস্থিরতাও তার ধীরে ধীরে কমে আসছে—নোরাকে সে ফিরে পেয়েছে।

মিঃ রিচার্ড তাঁবুতে ফিরে এসে একটা ইজি-চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিলেন। তাঁর পাশে একটা টুলের ওপর বসে জংলী সর্দার। জংলী সর্দারের হাতে জ্বলন্ত একটা সিগারেট। মিঃ রিচার্ড তাকে উপহার দিয়েছেন বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে। পরম তৃপ্তিতে সে সিগারেট টানছে আর এক মুখ করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

পাশে আর একটি চেয়ারে বসে আছেন মিঃ আয়রনসাইড্। জংলীদের ভাষা তিনি ছাড়া আর কেউ বোঝে না। যেটুকু বুঝতে পারেন না সেটা ওদের হাবভাবে বোঝেন। তিনি দোভাষীর কাজ করছেন, আর মিঃ রিচার্ড মনের আনন্দে জংলী-সদারের গল্প-গাছা উপভোগ করছেন।

হঠাৎ জংলী-সর্দারের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটি বহুপ্রত্যাশিত সংবাদ! আর একদল সাদা আদমী এই জঙ্গলেই তাঁবু ফেলেছে।

কে সে সাদা আদমী—বৈজ্ঞানিক ডাঃ মরিসন নয়তো? মিঃ রিচার্ডের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। মিঃ আয়রনসাইড্কে ভাল করে খুঁচিয়ে খবরটা বের করতে বলে তিনি পরম আগ্রহে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তার পর মিঃ আয়রনসাইড্ বললেন, "এ সর্দার ঠিক জানে না—জানে ওয়াম্বা, এরই কুটুম্ব, আর একদল জংলীদের সর্দার। অনেক দূরে নদীর ধারে তাদের বসতি।"

মিঃ রিচার্ড বললেন, "জিজ্ঞাসা করুন টারজানকে এর মধ্যে কোথাও দেখেছে কিনা।"

মিঃ আয়রনসাইডের প্রশ্নে জংলী সর্দারের মুখখানা হঠাৎ দীপ্ত হয়ে

উঠল। পরম উৎসাহের সঙ্গে সে যা বলতে আরম্ভ করল মিঃ আয়রন-সাইড্‌ শুনে একেবারে অবাক্‌।

মিঃ রিচার্ড আর ধৈর্য-ধারণ করতে পারছেন না। ওদের কথার মাঝেই বলে উঠলেন, "কী ব্যাপার, টারজানের খবর জানে নাকি জংলীটা?"

মিঃ আয়রনসাইড্‌ বললেন, "জানে। ওরই কুটুম্ব ওয়াম্বাদের গ্রামে একটা প্রকাণ্ড কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে রাগে পাগলের মত হয়ে উঠেছিল টারজান। কুমীরটাকে মেরে সে ক্ষান্ত হয়নি, গ্রামে ঢুকে ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে জ্বালিয়ে একাকার করে দিয়ে গেছে—এইতো সেদিনের কথা। তারপর আর টারজানের দেখা কেউ পায়নি। কোথায় ডুব মেরে বসে আছে কে জানে? রাগ পড়লে আবার তাকে পাওয়া যাবে।"

"ওয়াম্বাকে একবার পাওয়া যায় না?" মিঃ রিচার্ড প্রশ্ন করলেন।

মিঃ আয়রনসাইড্‌ বললেন, "নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, তবে অনেক দূরে থাকে সে—খবর দিয়ে আনতে দু-চার দিন দেরি হতে পারে।"

কথায় কথায় বেলা পড়ে এল। জংলী সর্দার ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। সন্ধ্যার আগেই তাকে গ্রামে ফিরতে হবে। সিংহ, চিতাবাঘের দল বেরিয়ে পড়বার আগেই ডেরায় না ফিরতে পারলে বিপদের সম্ভাবনা।

দেখতে দেখতে সাঁঝের আঁধার ঘনীভূত হয়ে এল। শিবিরের ভেতরের আলোগুলো জ্বলে উঠল। মিঃ রিচার্ড তখনও চিন্তিত হয়ে বসে রয়েছেন। অনেকগুলি সমস্যা তাঁর চোখের সামনে জট

বেঁধে রয়েছে। কিন্তু মনে মনে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টারজানকে নোরাকে উদ্ধার করতেই হবে, তাদের লোকালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। ইতিমধ্যে ডাঃ মরিসনের দেখা পাওয়া যায় ভাল, নইলে টারজান আর নোরাকে নিয়েই ফিরে যাবেন তিনি।

জঙ্গলের বাস এবারে তুলতে হবে। আর ভাল লাগছে না কারুরই। আর এই জংলীদের সাহায্যেই তিনি ওদের ধরতে পারবেন।

রাত ক্রমশঃ গভীর হল। চারিদিকে হিংস্র-জন্তুদের ডাক থেকে থেকে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। শিবিরের মধ্যে তখনও মিঃ রিচার্ডের পরামর্শ-সভা চলেছে পুরোদমে।

সমাপ্ত